

শিক্ষক সহায়িকা

# হিন্দুধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর



শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত  
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

---

শিক্ষক সহায়িকা  
**হিন্দুধর্ম শিক্ষা**  
অষ্টম শ্রেণি  
(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার  
অধ্যাপক ড. বিপুল কুমার বিশ্বাস  
সুবর্ণা সরকার  
জয়দীপ দে  
বহি বেপারী  
সুমন চক্রবর্তী  
ড. প্রবীর চন্দ্র রায়  
শাহ মো: জুলফিকার রহমান



# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ চিত্রণ

সজীব কুমার দে



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

## প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যঁারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



## ভূমিকা

### প্রিয় সহকর্মী,

অষ্টম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষার এই নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই!

এই শিক্ষক সহায়িকাটি আপনাকে অষ্টম শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) এর সেশনসমূহ পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। এই বইটি আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং সামর্থ্যকে বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। আপনার পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে এটি নতুন কিছু যোগ করবে। এই বইয়ের নির্দেশনার আলোকে কাজ করার মাধ্যমে আমরা সারা দেশের হিন্দুধর্ম শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীদের এক এবং অভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারব। তাতে শিক্ষার্থীরা এই নতুন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতির কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সম্পূর্ণভাবে এবং সমভাবে অর্জন করতে পারবে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন। কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে শিক্ষার্থীরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযুক্ত হয়ে উঠবে সেগুলোকে বিবেচনার কেন্দ্রে রেখে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় মাধ্যমিক স্তরে অষ্টম শ্রেণির হিন্দুধর্ম বিষয়ের জন্য ৩ টি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য সহযোগিতা প্রদান, প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই শিক্ষক সহায়িকাটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান শিক্ষাক্রমের আওতায় হিন্দুধর্ম শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং সার্বিকভাবে একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট হবেন এই সহায়িকায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।





## সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
বিষয় পরিচিতি	১-৮
প্রথম অধ্যায়	
শিখন অভিজ্ঞতা ১: হিন্দুধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তি	৯-১৭
শিখন অভিজ্ঞতা ২: গীতার বিষয়বস্তু	১৮-২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
শিখন অভিজ্ঞতা ৩: যোগাসন	২৯-৩৯
শিখন অভিজ্ঞতা ৪: ধর্মচার ও পূজা অর্চনা	৪০-৪৮
শিখন অভিজ্ঞতা ৫: ধর্মস্থান	৪৯-৫৯
তৃতীয় অধ্যায়	
শিখন অভিজ্ঞতা ৬: মূল্যবোধ চর্চা	৬০-৭১
শিখন অভিজ্ঞতা ৭: আদর্শ জীবন চরিত্র ও ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান	৭২-৯৭
শিখন অভিজ্ঞতা ৮: পরমতসহিষ্ণুতা	৯৮-১১১

# বিষয় পরিচিতি

## বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, বিশ্বাস ও জ্ঞানের উৎসসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন ও ধারণ করতে পারা। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বপালন এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারা।

## বিষয়ের ধারণায়ন

ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং ধর্মীয় জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধিবিধান ও অনুশাসন উপলব্ধি করে তা নিজ জীবনে অনুশীলন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধর্ম এক দিকে যেমন জীবনের অর্থ, মূল্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে তেমনি নিজেকে ও অন্যকে বুঝতেও সহায়তা করে। নিজেকে সৎ, নীতিবান, দায়িত্বশীল, দয়ালু ও মানবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক, শুদ্ধ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মশিক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করতে ধর্মের নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করা জরুরি যা সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে অপব্যাখ্যা করে কেউ যেন মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে কিংবা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি করতে না পারে তার জন্যও সঠিকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা জরুরি। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ধর্মশিক্ষা বিষয়টিকে তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে ধারণায়ন করা হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় বিধিবিধান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় এবং এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়া হবে-যা সার্বিকভাবে হিন্দুধর্মীয় শিক্ষার যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে।

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান ও বিশ্বাস, জ্ঞান আহরণে আগ্রহ ও জ্ঞানের উৎস, জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি, জ্ঞানের ব্যবহার ও প্রয়োগ
ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার জেনে ও উপলব্ধি করে চর্চা করা, ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অনুধাবন
ধর্মীয় মূল্যবোধ	প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয় আচরণ গ্রহণ ও চর্চা এবং নিন্দনীয় আচরণ বর্জন

ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিবিধানের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও চর্চায় অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে স্থিতিশীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ সুখী সমাজ তথা বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব যা শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রাধান্য পেয়েছে।



## যোগ্যতার ধারণা

জ্ঞান, দক্ষতা, ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে। চারটি উপাদানের এই সমন্বিত রূপ যোগ্যতার ধারণাকে পূর্বের শিখনফলের ধারণা থেকে পৃথক করেছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে।

## হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা :

হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হওয়া, বয়সোপযোগী বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজ জীবনে প্রয়োগ ও চর্চা করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।

বিস্তারিত শিক্ষাক্রম অনুসারে হিন্দুধর্ম শিক্ষার ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য উল্লিখিত শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটিকে নিচের তিনটি একক যোগ্যতায় রূপান্তর করা হয়েছে-

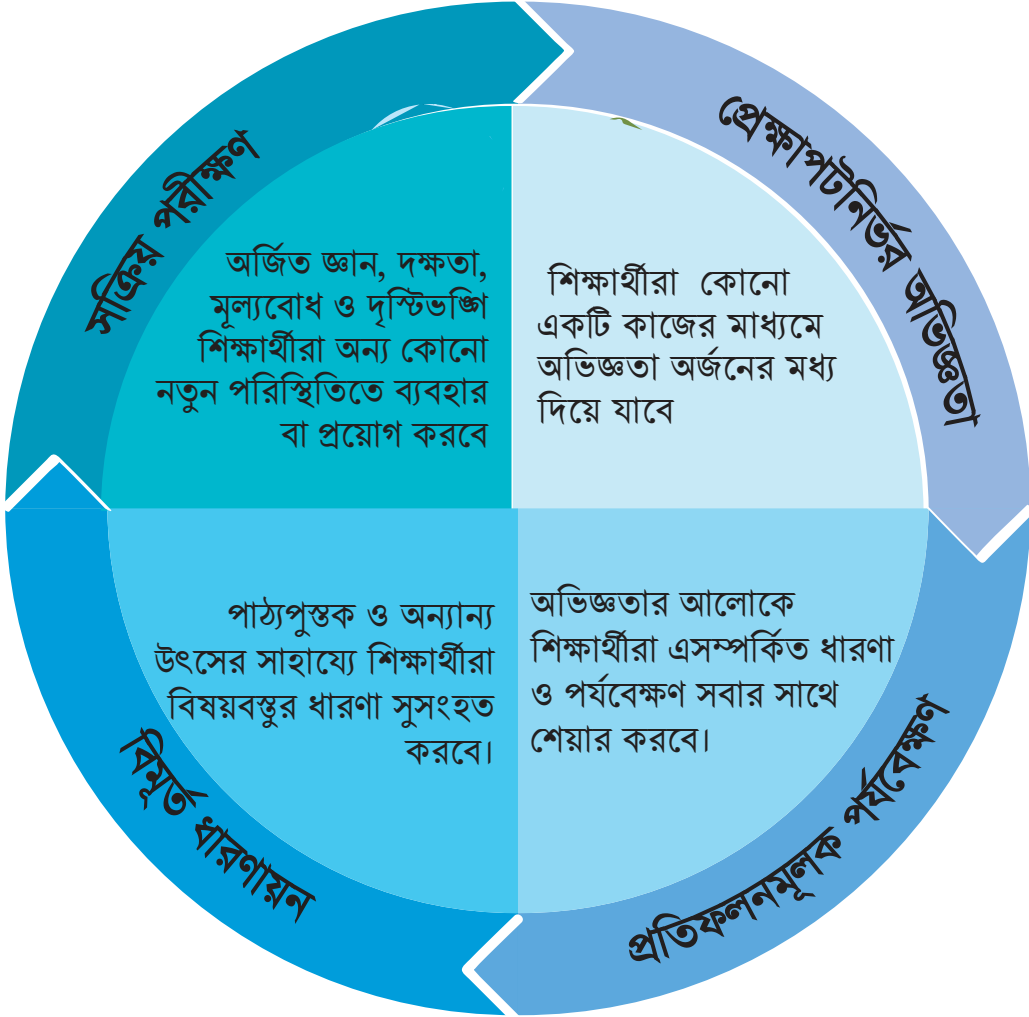
- ৬.১ হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা;
- ৬.২ হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা;
- ৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। এরপর তারা ধারাবাহিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের শিখন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে; যেন তারা নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখন সম্পন্ন হলে তা স্থায়ী হয় এবং ক্রমাগত উপলব্ধি বা প্রতিফলনের মাধ্যমে আচরণের ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটে। এবারের শিক্ষাক্রমে তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্নিবেশিত চক্রটিতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ধাপগুলো দেখানো হয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো, শিক্ষার্থী তার শিখন প্রক্রিয়ায় যদি এই ধাপগুলোর মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে শিখনটা স্থায়ীত্ব পাবে এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিত হবে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা বা কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিখন শুরু হয় একটি কাজ বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এরপর শিক্ষকের সামনে

তার প্রতিফলন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায় শিক্ষার্থীর বিদ্যমান অবস্থান। এরপর শুরু হয় পরবর্তী ধাপের শিখন কার্যক্রম। শিক্ষার্থীরা নিজেরা করে, দেখে শিখে, চিন্তা করে শিখে এবং প্রয়োগ করে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সচেতন, সক্রিয় ও স্বাধীন শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলে। নিচে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটি দেখানো হলো-



অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের চারটি মূল ধাপ হলো:

**প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা (Concrete Experience):** এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় বা কার্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো একটি কাজ বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এটি শ্রেণিতে বা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে এমনকি শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনের কোনো ঘটনাও অভিজ্ঞতা হিসাবে আসতে পারে। এখানে তারা একক বা দলীয়ভাবে কাজটি করতে পারে।

**প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ (Reflective Observation):** এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কাজ বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিজেদের ধারণা, পর্যবেক্ষণ, ও মতামত উপস্থাপন করে। অন্যের সঙ্গে নিজের ধারণা, মতামত ও

অভিজ্ঞতা যাচাই করে। এই ধাপে শিক্ষার্থীরা গভীরভাবে চিন্তা করে। এ ধাপে শিক্ষক সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর বিদ্যমান অবস্থান যাচাই করার সুযোগ পান।

**বিমূর্ত ধারণায়ন (Abstract Conceptualization):** এই ধাপে শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যমান ধারণার সাথে পাঠ্যপুস্তকসহ আরো বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত এ সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর বিষয়ক ধারণার সাথে তুলনা করে নিজের ধারণাকে সুসংহত করার সুযোগ পায় এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করে।

**সক্রিয় পরীক্ষণ (Active Experimentation):** এই ধাপে শিক্ষার্থীরা পূর্বের ধাপসমূহের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে নতুন বা পরিবর্তিত কোনো পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে অনুশীলন করে থাকে। মূলত অর্জিত শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারাই হলো মিথন যোগ্যতা অর্জন করা।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ ঘটানো এবং তাদের ২১শ শতাব্দীর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করানো।

### শিক্ষক সহায়িকা বই এর ব্যবহার: সাধারণ নির্দেশাবলি

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আওতায় হিন্দুধর্ম শিক্ষার প্রতিটি যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষক হিন্দুধর্ম শিক্ষার প্রতিটি যোগ্যতার ৪টি প্রধান উপাদান (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) স্পষ্টরূপে চিহ্নিত ও অনুধাবন করবেন।
- সকল শিখন কার্যক্রম যোগ্যতার উপাদানগুলোর সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। হিন্দুধর্ম বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতার জন্য প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার নমুনা অনুসরণ করবেন।
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়াগুলোর চর্চার সুযোগ রয়েছে সেগুলো হলো- আনন্দময় শিখন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে কাজভিত্তিক বা হাতে-কলমে শিখন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন, প্রজেক্টভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, একক, জোড়া এবং দলীয় কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ, বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন, অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন শিক্ষার্থীদের মাঝে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
- শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখন কার্যক্রম আবর্তিত হবে।
- হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক ও গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াসমূহের অগ্রাধিকার

দেয়া হয়েছে। কারণ এ ধরনের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের শেখার সর্বাধিক সুযোগ প্রদান করে এবং সম্পূর্ণরূপে দক্ষতা বিকাশ করার সুযোগ দেয়। এই শিক্ষক রিসোর্স বইয়ের বিভিন্ন ধাপে যে সকল গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নমুনা (সতীর্থ মূল্যায়ন, অভিভাবক মূল্যায়ন, শিক্ষকের আত্মমূল্যায়ন প্রভৃতি) সংযুক্ত করা হয়েছে, আমরা আশা করছি এ নমুনাগুলো হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিক্ষকদের মূল্যায়ন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করবে।

## সেশন

হিন্দুধর্ম শিক্ষার যে তিনটি যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে তা বছরে ৫৬ টি সেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

## জেভার

খেয়াল রাখবেন ছেলে-মেয়ে বা তৃতীয় লিঙ্গা নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থী যেন সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। ছবি আঁকার সময় ছেলেরা মেয়েদের বা মেয়েরা ছেলেদের বা কোনো শিক্ষার্থী অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে উপহাস বা হাস্যরস না করে। শ্রেণিতে যেন একটা পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক থাকে সে বিষয়ে আগে থেকেই গ্রাউন্ডরুলস তৈরি করে দিন। দল বা জোড়া নির্বাচনের সময় ছেলে বা মেয়ের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবাই শ্রেণির সব কাজ করবে সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন। ছেলেদের বা মেয়েদের বলে আলাদাভাবে কোনো কাজ চিহ্নিত করবেন না।

## ইনকুশন

সব শিক্ষার্থী যেন অংশগ্রহণ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পছন্দ (Choice) ও সামর্থ্যকে (Capability) গুরুত্ব দিন। যেমন কোনো শিক্ষার্থী যদি ছবি না ঝঁকে অন্যভাবে হাতে-কলমে প্রকাশ করতে চায় সেটিকে উৎসাহ দিন। কোনো শিক্ষার্থীর যদি বাক্জনিত সমস্যা থাকে তাকে আলোচনার সময় অন্যভাবে মত প্রকাশ করতে দিন। কোনো শিক্ষার্থীর যদি শারীরিক কারণে দেয়ালে ছবি টাঙাতে অসুবিধা হয়, তাকে তার জায়গায় বসে ছবি দেখিয়ে মত প্রকাশ করতে দিন, অথবা তার অনুমতি নিয়ে আপনি নিজে বা শিক্ষার্থীদের কেউ দেয়ালে ছবিটি লাগিয়ে দিন। কোনো শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মান আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তা সবসময় বিবেচনায় রাখুন, যেমন কেউ ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হলে তাকে সামনে বসার ব্যবস্থা করে দিন। বছরের মাঝামাঝি বা ব্যতিক্রমী কোনো সময়ে নতুন কোনো শিক্ষার্থী এলে তাকে সবার সাথে পরিচিত করিয়ে সহজ হতে সাহায্য করুন।

## মূল্যায়ন

যেহেতু এবার কোনো পরীক্ষা থাকছে না, শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে আচরণ, অংশগ্রহণ, উপস্থাপন, অর্পিত কাজ, ইত্যাদির ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হবে, যেখানে শিক্ষকের পাশাপাশি সতীর্থ এবং বাবা-মা/অভিভাবকের মূল্যায়নের সুযোগ আছে। এসংক্রান্ত যাচাই তালিকা এবং রুব্রিকগুলো এ সহায়িকার শেষে সংযুক্ত আছে। বছরের প্রথম থেকেই শিক্ষকগণ যাতে শিখনকালীন এবং নির্দিষ্ট সময়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রমানক এবং তথ্যসমূহ সহজেই সংরক্ষণ করতে পারে সে জন্য শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য 'নৈপুণ্য' নামক একটি অ্যাপ আছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে শুধু মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ নয় এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ট্রান্সক্রিপ্টও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা যাবে। অ্যাপটি কীভাবে ব্যবহার করা যাবে তার গাইডলাইন ইতোমধ্যে শিক্ষকদেরকে দেয়া হয়েছে।

## শিখন উপকরণ:

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব স্কুল থেকে উপকরণগুলো সরবরাহ করতে। যেসব উপকরণ শিক্ষার্থীকে সংগ্রহ করতে হয় সেগুলো যেন সহজলভ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। ব্যবহৃত উপকরণের বদলে রিসাইক্লিং, রিইউজ এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণকে গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষার্থীকে বিকল্প এবং সৃজনশীল উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন। যেমন: নতুন কাগজের বদলে পুরোনো ক্যালেন্ডার ব্যবহার, প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার ইত্যাদি। শিক্ষার্থী যেন উপকরণ কেনার বদলে যথাসম্ভব আশেপাশে পাওয়া যায় এরকম জিনিস ব্যবহার করে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উপকরণ কতটা জাঁকজমকপূর্ণ সেটি বিবেচনা না করে সে কতখানি যোগ্যতা অর্জন করল, কেবল সেটি বিবেচনা করবেন।

## বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সহায়িকা বই কীভাবে ব্যবহার করবেন

কোভিড-১৯ অতিমারি বাংলাদেশ এবং পুরো পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্য সম্পাদন করা হবে তা নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। পরিচিত, কোলাহলমুখর এবং প্রাণচঞ্চল সরাসরি সেশনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর একজন শিক্ষক হিসেবে অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও আপনি এই সময়ে হয়তো অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করেছেন।

লক্ষ্য করুন, সেশন Online হোক বা সরাসরি, শিখন-শিক্ষণের মূল দর্শন বা ভাবনা কিন্তু একই। তাই কিছু বিশেষ প্রস্তুতি আপনাকে সরাসরি সেশনের অনুরূপ দক্ষতা বা সাবলীলতায় Online সেশন পরিচালনার জন্য কিছু প্রস্তুতি করতে হতে পারে। আর কোভিড-১৯ বা এজাতীয় কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে দেশ বা এলাকাব্যাপী লকডাউনে পুনরায় Online সেশন চালু হওয়া সম্ভবপর একটি ঘটনা। সে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এই প্রস্তুতি অর্জন করা ভারী গুরুত্বপূর্ণ।

এই সহায়িকা বইয়ে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে কীভাবে, বিশেষভাবে অনলাইনে কীভাবে পরিচালনা করবেন তার কিছু প্রস্তাব এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং আরও কিছু সক্ষমতা যেমন কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, ইন্টারনেট সংযোগ, প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা, প্রভৃতি আপনাকে এখানে প্রস্তাবিত উপায়গুলোকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন মাত্রার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। এই প্রস্তাবগুলো আপনার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার অনুরোধ রইলো।

যে সকল শিক্ষার্থীর শুনতে, বলতে, দৃষ্টিসংক্রান্ত অথবা অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের জন্য Online সেশন সম্পাদনে বিশেষভাবে যত্ন নিন। শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে কথা বলুন। কোনো কাজ সম্পাদনে অন্য শিক্ষার্থী থেকে তাকে সময় বাড়িয়ে দিন। খুঁজে দেখুন বিশেষ কোনো শিক্ষা উপকরণ আছে কি না যা ঐ শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক হবে। যেমন দৃষ্টিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় Screen-এর সকল Text পড়ে শোনায় এমন Application ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন একটি free application হলো NVDA (<https://www.nvaccess.org/>)। পাশাপাশি যে শিক্ষার্থী কিঞ্চিৎ দেখতে পায় তার জন্য Monitor-এর Scaling level বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা দিন।

Online সেশন পরিচালনায় কিছু Application Software যেমন Zoom বা Google Classroom,

এমনকি Facebook-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই Application-গুলো বেশ সহজ বা Intuitive যা আপনি হয়তো ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার করতে পারা এবং ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারা প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নের জন্য পূর্বাবশ্যক। তাই Application-গুলো ব্যবহারে পারদর্শী হতে চেষ্টা করুন: এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ হলে তাতে অংশগ্রহণ করুন, You Tube-এ বাংলা কিংবা ইংরেজিতে সহায়ক video দেখুন, বা পরিচিত কারও কাছ থেকে শিখে নিন।

প্রথম এবং প্রধান কথা হলো শিখন-শিক্ষণ একটি সামাজিক ঘটনা। তাই এটা মাথায় রাখুন Online-এ শিক্ষার্থীরা যাতে একে অপরের সাথে এবং আপনার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণের সকল ধাপে অংশগ্রহণ করে। এটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আলোচনার আয়োজন বা অবস্থা সৃষ্টি করা। এই আলোচনা যখন প্রাঞ্জল হয়, শিক্ষার্থীরা যখন আনন্দের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তখন Online-এ সেশন সম্পাদনের যে সকল ত্রুটি আছে তা অনেকাংশে লাঘব হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো আপনার Online সেশনটি যাতে শিক্ষার্থীর জন্য আগ্রহোদ্দীপক এবং উষ্ণ হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এই শিক্ষক সহায়িকা বইয়ের বর্ণিত সকল সেশনগুলো এমনভাবে design করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা খুব কৌতূহলোদ্দীপকভাবে ধরা দেয়। তাই এই সেশনগুলো Online-এ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও আপনার পক্ষ থেকে এই বিষয়টি মনে রাখুন। সরাসরি সেশনের বিভিন্ন অংশগুলো Online-এ কেমন হতে পারে তার কিছু ধারণা নিচে দেওয়া হলো।

সরাসরি সেশন	অনলাইন সেশন
আপনি বক্তৃতার মাধ্যমে কিছু তথ্য সরাসরি জানান	আপনি PowerPoint Presentation দেখান, সাথে বক্তৃতা বা ধারাভাষ্য দিন
আপনি শিক্ষার্থীদের Field trip-এ নিয়ে যান	শিক্ষার্থীদের যে জায়গায় নিয়ে যেতেন তার ভিডিও/ছবি দেখান
আপনি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন	আপনি Online-এ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন
শিক্ষার্থী কোনো কিছু উপস্থাপন করে	শিক্ষার্থী PowerPoint-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করে (যেমন Zoom-এ share screen ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ আলোচনা করে (যেমন Zoom-এ breakout ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ করে	শিক্ষার্থীরা Online application -এ দলগত কাজ করে (যেমন Zoom-এ breakout room ব্যবহার করে এবং পাশাপাশি ইমেইল ও অন্যান্য application ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লিখে বা আঁকে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ লিখে বা আঁকে (যেমন Zoom-এ Whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লিখে বা আঁকে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ লিখে বা আঁকে (যেমন Zoom-এ Whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা কোনো লিখিত কিছু জমা দেয়	শিক্ষার্থীরা Word file বা PDF শিক্ষককে online-এ পাঠায় (যেমন ইমেইলে)



আপনার সেশনটি কীভাবে শুরু করবেন এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা আকর্ষণীয় হবে কি না তা সেশন শুরুর পূর্বে বিশেষভাবে ভেবে রাখুন। একটি নির্দিষ্ট সময় রাখুন শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং খোশগল্প করার জন্য। সেশন চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাম ধরে সম্বোধন করুন এবং চেষ্টা করুন **class size** যেমনই হোক না কেনো সবাই যাতে সেশনে সম্পৃক্ত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া শুনুন এবং অন্য শিক্ষার্থীর সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন করুন। দলগত কাজ দিতে পারেন (যেমন **Zoom**-এর **breakout room** ব্যবহার করে)।

**Online**-এ সেশন পরিচালনায় কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকুন। ইন্টারনেট সংযোগের অপ্রতুলতা বা গতি নিয়ে সমস্যা না থাকলে শিক্ষার্থীদের ক্যামেরা চালু রাখতে বলুন। ক্যামেরা চালু রাখাটা সেশনের সকল কার্যাবলীর জন্য যেমন সহায়ক, তেমনি শিক্ষার্থীরা **Online** সেশনে অংশগ্রহণ করছে না যোগ দিয়ে চলে গিয়েছে তা বুঝতেও সাহায্য করে। **Online**-এ কোনো শিক্ষার্থী যাতে অপর কোনো শিক্ষার্থীকে উত্যক্ত না করে সে দিকে বিশেষ নজর দিন। এরকম কোনো কিছু ঘটলে সাথে সাথে থামান, এবং ব্যবস্থা নিন। উত্যক্তকারী শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলুন এবং উত্যক্তের শিকার শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণামূলক কথা বলে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করুন। **Online bullying** বা **cyberbullying** একটি ঘৃণ্য সমস্যা যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করুন।

সর্বোপরি **Online** সেশনকে অনুকূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারার অনুরোধ রইলো। এই ব্যবস্থায় **video** এবং অন্যান্য অনেক **interactive** উপকরণ ব্যবহার বেশ সহজ হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের বদলে একটা ভিন্ন পরিবেশে মানে তার নিজের ঘরের পরিবেশে মজার অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করার দারুণ চমৎকার কাজটি কিন্তু আপনিই করছেন!

# প্রথম অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### যোগ্যতা ৮.১

হিন্দুধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (ধর্মগ্রন্থের) নির্দেশনার আলোকে যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।

### বিষয়বস্তু

ব্রহ্ম, অবতার, জন্মান্তরবাদ, মুক্তি (মোক্ষলাভ), চতুরাশ্রম, যুগধর্ম, চতুর্বর্গ

### শিখন অভিজ্ঞতা ১: হিন্দুধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তি

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

- হিন্দুধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জানা ও বিশ্বাস স্থাপন করা
- কোনো বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি তৈরি হলে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে তা দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা

### অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পূর্বের শ্রেণিগুলোতে তারা কী কী পড়েছে সে সম্পর্কে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা স্মৃতি থেকে সেসব তথ্য দেবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনার করবেন। শিক্ষার্থীরা হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে এককভাবে পাঠ্যবইয়ের তথ্যবৃক্ষ পূরণ করবে। শিক্ষার্থীরা দল/জোড়ায় তথ্যবৃক্ষ ব্যবহার করে হিন্দুধর্মের প্রধান বিষয়সমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রহ্ম, জন্মান্তরবাদ, মুক্তি (মোক্ষলাভ), অবতার, চতুর্বর্গ, চতুরাশ্রম, যুগধর্ম সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা সাতটি/কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। পরিবার ও সমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা এবং পত্রিকা, বই, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যম থেকে এসব বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করবে। এসব বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপকরণ যোগাড় করবে। সংগৃহীত তথ্য ও উপকরণ এবং নিজেদের সৃজনশীল লেখা নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ দলের স্টলে সেসব প্রদর্শন করবে।

## হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তু

### বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৬ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।



### ধাপ-১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

#### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীরা আগের শ্রেণিতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কী কী জেনেছে তা নিয়ে প্রশ্ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন, হিন্দুধর্ম বললে কী কী বিষয় তাদের মনে আসে।
- পাঠ্যবইয়ে থাকা তথ্যবৃক্ষ এককভাবে পূরণ করে শিক্ষার্থীদের ধারণাগুলো প্রকাশ করতে বলুন।

## ধাপ-২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়া গঠন করতে সাহায্য করুন।
- এবারে প্রত্যেক দল/ জোড়াকে তাদের তথ্যবৃক্ষ ব্যবহার করে হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের তালিকা তৈরি করে পাঠ্যবইয়ে লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের তৈরি তালিকা পোস্টার পেপার বা বড় আকারের কাগজে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।

## ধাপ-৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, এই যে তোমরা হিন্দুধর্মের নানান বিশ্বাস ও ধারণা নিয়ে কাজ করলে, হিন্দুধর্মে এগুলোসহ আরও কিছু মৌলিক বিষয়বস্তু রয়েছে।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে হিন্দুধর্মে মৌলিক বিষয়বস্তুর কথা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।
- ব্রহ্মের ধারণার শুরুতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে ‘তুমি নির্মল কর মঞ্জল করে’ গানটি গাইতে বলতে পারেন। জন্মান্তরের ধারণা দেবার আগে শিক্ষার্থীদের দিয়ে জীবনানন্দ দাশের ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতাটি আবৃত্তি করাতে পারেন। কোন শিক্ষার্থীর যদি কবিতাটি জানা না থাকে তাহলে শিক্ষক তা আবৃত্তি করবেন।

## সহায়ক তথ্য

## হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়

প্রতিটি ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস আছে। এসব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ধর্মটি পরিচালিত হয়। ধর্মাবলম্বীরা সেই বিশ্বাসের আলোকে নিজ জীবনের গতিপথ ঠিক করে নেন। হিন্দুধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়। সুমহান এই প্রাচীন ধর্মটি হাজার হাজার বছর ধরে মুনি-ঋষিদের সাধনা ও উপলব্ধির ফসল। এখানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথ ও চিন্তা আছে, তেমনি কিছু কিছু বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন। হিন্দুধর্মের যেসব বিষয়ে সকলে সহমত, সেগুলোই হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়। এরকম কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

## ব্রহ্ম

বেদের একটি অংশ উপনিষদ। এখানে ব্রহ্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়েছে।

‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ যা অপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আর কিছু হতে পারে না।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে উল্লেখ আছে ঋষি ভৃগু পিতা বরুণের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, ব্রহ্ম কী?

উত্তরে পিতা বলেছিলেন, এই ভূতসমূহ (পৃথিবী সৃষ্টির মৌলিক উপাদানকে ভূত বলা হয়) যাঁ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যাঁ দ্বারা টিকে আছে এবং বিনাশের পর যাঁতে লীন হয়ে যায়, তুমি তাঁকে বিশেষরূপে জানতে চাও, তিনিই ব্রহ্ম।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে যেসব ধারণা পাওয়া যায়—

১. যিনি সকল জীব ও বস্তুতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে ‘সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’। সর্বত্র বিরাজ করছেন ব্রহ্ম। তাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি। তাঁতেই জগত মিলিয়ে যায়। তাঁতেই জীবিত থাকে।
২. ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হলেও তিনি কিন্তু একই। অর্থাৎ বহুত্বের মধ্যে একত্ব। আগুন একেক জায়গায় একেক রূপ ধারণ করে। কিন্তু আগুন তো শেষমেশ আগুনই থেকে যায়।
৩. তিনি জগত সৃষ্টি করেছেন। আবার জগতের অভ্যন্তরে থেকেই জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। মাকরশা যেমন নিজের শরীর থেকেই জাল বোনে আবার সেই জালের মধ্যেই অবস্থান করে।
৪. ব্রহ্ম রস স্বরূপ। তিনি এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন রস আশ্বাদনের জন্য। রসের আরেক রূপ অমৃত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বলেছিলেন, ‘অমৃতের পুত্র কী মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চান না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী- পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্য-ভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ।’
৫. ব্রহ্ম রস আশ্বাদন করে আনন্দ পান। আনন্দ থেকে পঞ্চভূত অর্থাৎ আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, মাটি সৃষ্টি।

‘ওঁ’ শব্দকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়।

ব্রহ্মকে বলা হয় ত্রিগুণাতীত। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে সত্ত্ব (ইতিবাচক), রজো (কর্মোদ্যম) এবং তমো (নেতিবাচক) এই তিনটি গুণের কোনোটিরই প্রকাশ নেই। তাঁকে কোনো উপাধিতে ভূষিত করা যায় না। এই ব্রহ্মকে ‘নিরূপা-

মিক' ব্রহ্ম বলা হয়। এই রূপে তিনি এক ও অদ্বিতীয়, নিরাকার পরমব্রহ্ম; তিনি অন্তহীন এবং ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে বিরাজমান।

আবার ব্রহ্মের আরও একটি রূপ আছে তার নাম হলো 'সোপাধিক' ব্রহ্ম। এই রূপে তিনি উপাধিযুক্ত। অর্থাৎ তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যেমন ব্রহ্ম যখন জীবের সকল কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। এখানে 'ঈশ্বর' হলো তাঁর উপাধি। ঈশ্বরকে আমরা ভগবানও বলি। 'ভগ' শব্দের অর্থ—ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ছয়টি গুণ আছে বলে ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্রহ্ম সম্পর্কে এক/ একাধিক বাক্য বলতে বলুন। (শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬/৭ জন হলে একটি বাক্যই যথেষ্ট হবে। এরচেয়ে কম হলে একাধিক বাক্য বলতে বলুন।)
- সকলের বলা শেষে শিক্ষার্থীকে বলুন, সকলের বলা বাক্যগুলোর মধ্য থেকে তার ভালো লেগেছে এরকম তিনটি বাক্য পাঠ্যবইয়ের 'ব্রহ্মের ধারণা' ছকে লিখে রাখতে। (শিক্ষার্থী চাইলে নিজের বলা বাক্যও লিখতে পারে।)

## জন্মান্তর

- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন, তাদের পাঠ্যবইয়ের ছবি: ১ (জন্মান্তরের চক্র) এবং ছবি: ২ (মোক্ষলাভের প্রবাহচিত্র)- এ কী বোঝানো হচ্ছে?
- তাদের আলোচনা করার সুযোগ দিন। সবাইকে আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহিত করুন। (আপনি নিজে কোনো মতামত দেবেন না।)

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, রথকে চালানোর জন্য যেমন রথী থাকে, তেমনি মানুষের দেহকে পরিচালনার জন্য যে সত্তা আছে তাই আত্মা। এই আত্মা দুইভাবে প্রকাশিত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমাত্মা। সেই আত্মারই একটি অংশ আমরা ধারণ করে আছি জীবাত্মা রূপে।

সূর্য যদি পরমাত্মা হয়, আমরা একেকটি পরমাণু যেন। পরমাত্মা থেকে যেমন জীবাত্মার সৃষ্টি, তেমনি এটি পরমাত্মায় মিলিয়েও যায়। এর ধ্বংস বা বিনাশ নেই। গীতায় আত্মার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শস্ত্র (একধরনের অস্ত্র) একে ছিন্ন করতে পারে না। আগুন একে দগ্ধ করতে পারে না। জলও আর্দ্র করতে পারে না। বায়ু পারে না শুষ্ক করতে।

এই আত্মা এক দেহ থেকে আরেক দেহে স্থানান্তরিত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, একটি জেঁক যেমন একটি তৃণের উপর বসে সেই পুরনো তৃণ ছেড়ে নতুন তৃণ গ্রহণ করে, তেমনি জীবাত্মা পুরনো স্থূল দেহ ছেড়ে নতুন দেহ ধারণ করে।

মৃত্যুর পর আবার জন্ম নেয়াকে জন্মান্তর বলা হয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর গতজন্মের কর্ম অনুসারে একজন মানুষ নতুন জন্মলাভ করে অথবা মোক্ষলাভ করে।

জন্ম-মৃত্যু আবার পুনর্জন্মের এই চক্রকে ভবচক্র বলা হয়।



## মোক্ষলাভ (মুক্তি)

মানুষ জন্মলাভ করে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবন কাটায় তারপর মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পরে মানুষ মোক্ষলাভ করে অথবা আবার জন্ম নেয়। হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করা হয়, জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের প্রধান লক্ষ্য। এই মুক্তিকে বলা হয় মোক্ষ বা নির্বাণ বা অমৃতলাভ। মুক্তিলাভ করলে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশে যায়; দুঃখ জরা গ্লানি আর মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না।

মোক্ষলাভ হলে মানুষ কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি পায়, নিজের সমস্ত কাজ এবং কাজের ফলাফল ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করে। মাটির পাত্রের জলের যেমন আলাদা অবস্থান আছে কিন্তু পাত্রকে ভেঙে দিলে সে বৃহৎ জলের সঙ্গে মিশে যায়। তেমনি জীবাত্মাও মোক্ষলাভ করে পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়।

কিন্তু মুক্তি লাভের উপায় কী? শ্বেতাস্বতরো উপনিষদে (৩৮) বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসী নরনারী ও দিব্যধামবাসী! তোমরা শোনো, আমি অন্ধকারের ওপারে অবস্থিত সেই জ্যোতির্ময় পুরাণ পুরুষকে জেনেছি এবং জেনে মৃত্যু-ঞ্জয়ী হয়েছি। ইহা ব্যতীত অমৃত লাভের অন্য কোন উপায় নেই।

জ্যোতির্ময় পুরাণ পুরুষ হচ্ছেন ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মকে না জানা পর্যন্ত মুক্তির উপায় নেই।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় হলো সাধনা। হিন্দুধর্মে সাধনার তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে।

**১. বৈরাগ্য সাধনা:** কোনোকিছুর প্রতি আসক্ত না হয়ে কেবল ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। যিনি বৈরাগ্য সাধনা করেন তিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর আমার সব দায়িত্ব নিয়েছেন, আমার আর ঈশ্বরের সন্তার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

**২. যোগাভ্যাস:** যোগের অর্থ পরমেশ্বরের তীর সান্নিধ্যলাভ। যোগাভ্যাস করার জন্য কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়— সংযম, নিয়ম, বিভিন্ন আসন, শ্বাসচর্চা, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ। সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা, ইত্যাদি।

**৩. ভক্তি:** পরমেশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে ভক্তি। আত্মীয়-পরিজনের প্রতি ভালোবাসার উর্ধ্বে ভগবানের প্রতি এই ভালোবাসা। ভক্ত এখানে ঈশ্বরকে খুব কাছের এবং আপন বলে ভাবেন। ভাবতে ভাবতে তিনি সবকিছুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখতে পান। নানার-কম পূজা-পার্বণ, ধ্যান, মন্ত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে এই সাধনাপথ তৈরি হয়েছে।

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ‘পুনর্জন্ম কিংবা মোক্ষলাভ’ ছকটি এককভাবে পূরণ করতে বলুন। এখানে পুনর্জন্ম এবং মোক্ষলাভ করা— এর কোনটি শিক্ষার্থী চায় তা টিক চিহ্ন দিয়ে বেছে নেবে। কেন চায় তা দুটি যুক্তি দিয়ে লিখে প্রকাশ করবে।
- কাজ শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার লেখা সকলকে পড়ে শোনাতে বলবেন।

## অবতার

ঈশ্বর তীর মহামায়া শক্তিকে অবলম্বন করে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্য তিনটি রূপ ধারণ করেন— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। বিষ্ণু ঈশ্বরের জগত-পালক রূপ। জগতের রক্ষায় বিষ্ণু বিভিন্ন সময়ে মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পৃথিবীতে যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ঈশ্বর যখন ধর্ম রক্ষার জন্য দে-

হধারণ করে পৃথিবীতে আসেন তখন তাঁকে অবতার বলা হয়।

ঈশ্বর নিরাকার। তিনি এক এবং অভিন্ন। বিভিন্ন দেব-দেবী ও অবতার নিরাকার ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ।

পুরাণে বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা বলা হয়েছে। সংক্ষেপে একে দশাবতার বলা হয়।

### দশাবতার-পরিচয়

নাম	সময়কাল	রূপ	অবতরণের উদ্দেশ্য
মৎস্য	সত্যযুগ	মাছ	জলের প্লাবন থেকে সকল জীবকে রক্ষা করা
কূর্ম	সত্যযুগ	কচ্ছপ	প্লাবনে ডুবে যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করা
বরাহ	সত্যযুগ	শুকর	দানব হিরণ্যাক্ষর ডুবিয়ে দেওয়া পৃথিবীকে সমুদ্রে তলা থেকে তুলে আনা
নৃসিংহ	সত্যযুগ	অর্ধ মানুষ, অর্ধ সিংহ	দানব হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা
বামন	ত্রৈতায়ুগ	বামনাকৃতি মানুষ	দৈত্যরাজ বলীকে দমন করে দেবতাদের রক্ষা করা
পরশুরাম	ত্রৈতায়ুগ	মানুষ	অত্যাচারীর হাত থেকে ধার্মিকদের রক্ষা করা
রাম	ত্রৈতায়ুগ	মানুষ	সত্য রক্ষা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা
বলরাম	দ্বাপর	মানুষ	ধর্ম প্রতিষ্ঠা
বুদ্ধ	খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩—৫৪৩ অব্দ	মানুষ	দুঃখ থেকে মুক্তির পথ দেখানো
কল্কি	কলিযুগের শেষে (অবতীর্ণ হবেন)	মানুষ	অন্যায়কারীদের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা

- শিক্ষার্থীদের বলুন, দশাবতারের ছকটি তারা দেখেছে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতেও অবতার সম্পর্কে জেনেছে— এসবের আলোকে প্রত্যেকে নিজের পছন্দের অবতারকে নিয়ে পাঠ্যবইয়ের ‘পোস্টারে অবতার’ ছকে এককভাবে একটি সুন্দর পোস্টার তৈরি করতে।
- পোস্টারে সংশ্লিষ্ট অবতারের যে-কোনো একটি কাজের ছবি আঁকবে/ সংগ্রহ করে আঠা দিয়ে সাঁটাবে, তাঁর সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখবে এবং পোস্টারটি আলপনা, নকশা ইত্যাদি ঐক্রে সুন্দর করে অলঙ্করণ করবে।

### চতুর্ভাগ

হিন্দুধর্মের প্রধান লক্ষ্য মুক্তি বা মোক্ষলাভ হলেও বাস্তবজীবনের প্রয়োজনকে কখনো অস্বীকার করা হয়নি। এছাড়া বাস্তবজীবনের আরো তিন লক্ষ্য আছে— ধর্ম (ন্যায়পরায়ণতা), অর্থ (ধন-সম্পদ) এবং কাম/ কামনা

56

স্মৃতি অংশে রয়েছে বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণ। এতে জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, নিয়ম ও রীতি নীতি রয়েছে। কিন্তু একেক যুগের নিয়ম কানুন আরেক যুগে চলে না। যুগের সঙ্গে সঙ্গে প্রথা ও নিয়মের পরিবর্তন-কে যুগধর্ম বলা হয়।

আবার শাস্ত্রে কোন যুগে কোনটি ধর্ম হবে তাও বলা হয়েছে। আবার হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সময়কালকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ ও কলি যুগ। সত্যযুগে সবাই সত্য কথা বলত। সৎ পথে চলত। কিন্তু ত্রেতায়ুগে তা এক চতুর্থাংশ কমে আসে। পরের দুই যুগেও সমান পরিমাণে কমে আসে। এখন কলিযুগ চলছে। অর্থাৎ চতুর্থ যুগ। এই যুগের পর সত্য ফুরিয়ে যাবে। আবার নতুন করে সত্যযুগের শুরু হবে। এভাবে যুগচক্র চলবে।

মনুসংহিতায় এক এক যুগে একটি কর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে—

“তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়ং জ্ঞানমুচ্যতে।

দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহর্দানমেকং কলৌ যুগে।।” (মনুসংহিতা ১।৮৬)

**সরলার্থ:** সত্যযুগে তপস্যাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ত্রেতায়ুগে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, দ্বাপর যুগে যজ্ঞ এবং কলিতে একমাত্র দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

## ধাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের জোড়া/ দলের মধ্যে ব্রহ্ম, অবতার, জন্মান্তরবাদ, মুক্তি (মোক্ষলাভ), চতুরাশ্রম, যুগধর্ম, চতুর্বর্গ — এই সাতটি বিষয়কে ভাগ করে দিন। শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলে একটি দলে একাধিক বিষয় দিতে পারেন।
- পরিবার বা সমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং পত্রিকা, বই, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যম থেকে এসব বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপকরণ যোগাড় করতে বলুন।
- সংগৃহীত তথ্য-উপকরণ এবং নিজেদের সৃজনশীল লেখা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ‘হিন্দুধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তি’ প্রদর্শনীর আয়োজন করতে বলুন।
- প্রতিটি জোড়া/ দল নিজ নিজ স্টলে সেসব প্রদর্শন করবে।
- সম্ভব হলে প্রদর্শনী দেখবার জন্য স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র, বাইরের অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা করুন। শিক্ষার্থীদের হাতে লেখা আমন্ত্রণপত্র তৈরি করতে দিতে পারেন।
- প্রদর্শনী শেষে প্রদর্শনী থেকে পাওয়া এমন একটি শিক্ষার কথা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ‘জীবনদর্শন’ ছকে লিখতে বলুন যা তার জীবনে কাজে লাগবে বলে মনে করছে। এই কাজটি বাড়িতেও করতে দিতে পারেন।

# প্রথম অধ্যায়

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### যোগ্যতা ৮.১

হিন্দুধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (ধর্মগ্রন্থের) নির্দেশনার আলোকে যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।

### শিখন অভিজ্ঞতা ২: গীতার বিষয়বস্তু

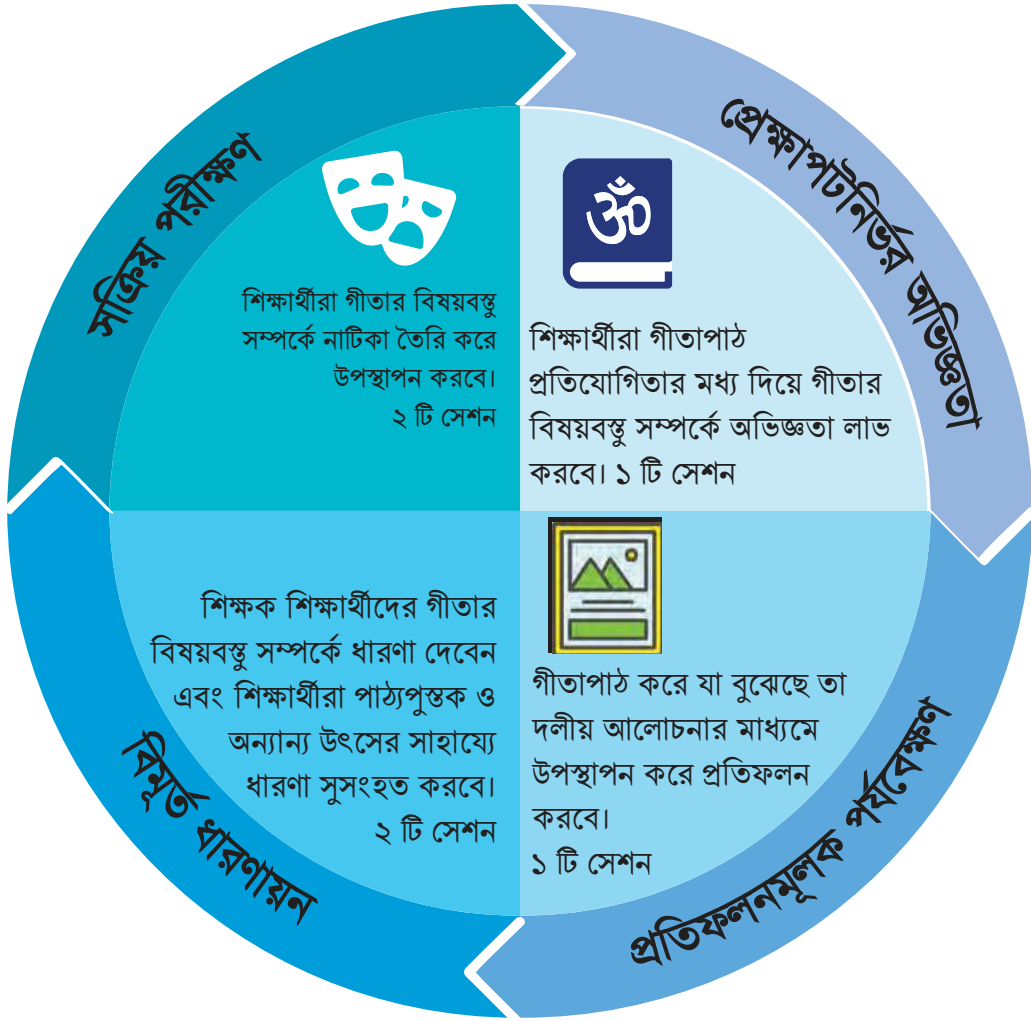
এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে—

- গীতা পাঠ করতে পারা
- গীতার দর্শন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
- গীতার নির্দেশনার আলোকে জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তিতে সঠিক পথের দিশা খুঁজতে পারা

### অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই থেকে গীতার শ্লোক অর্থসহ আবৃত্তি করে গীতাপাঠ প্রতিযোগিতা করবে। গীতা পাঠের মাধ্যমে যা জানল তা দলে/জোড়ায় আলোচনা করে এককভাবে বলবে। শ্লোকগুলো থেকে যা বুঝেছে তা এককভাবে লিখে রাখবে। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গীতার বিষয়বস্তু ও দর্শন সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে গীতার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে।

**বিশেষ নির্দেশনা:** শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৬ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করবেন।



## ধাপ ১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

### সেশন ১ টি

- এই সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন যে তারা সপ্তম শ্রেণিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কে জেনেছে, গীতার শ্লোকও পড়েছে। নিজেদের বাড়িতে, বিভিন্ন ধর্মীয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে গীতাপাঠ শুনেছে।
- তাদের জানান, গীতা যেমন ধর্মীয় গ্রন্থ তেমনি এটি দর্শনশাস্ত্রেরও বই। গীতাপাঠ করে যেমন আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটে তেমনি জীবনের নানা সংকটে, দ্বিধায় গীতার বাণী থেকে সঠিক সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীদের শ্রুতিমধুরভাবে, ছন্দ অনুসারে গীতাপাঠ/ আবৃত্তি করার পদ্ধতি যতটা সম্ভব দেখিয়ে দিন।
- এবারে শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা একটি গীতাপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করব। তাদের পাঠ্যবই থেকে একটি গীতার শ্লোক (অর্থসহ) আবৃত্তি করে শোনাতে বলুন।
- একে একে চারটি শ্লোকই (অর্থসহ) আবৃত্তি করতে বলুন।
- প্রতিযোগিতা শেষে আপনার ফিডব্যাক দিন।



## ধাপ ২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীরা গীতাপাঠ করে কী বুঝল তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে/জোড়ায় আলোচনা করতে দিন।
- আলোচনার পরে প্রতিটি জোড়া/দলকে একেবারে নিজের ভাষায়, অল্প কথায় সকলের সামনে উপস্থাপন করতে বলুন। একটি দল/জোড়ার কথা বলা শেষ হলে পরের জোড়া/দলকে বলবেন, যা বলা হলো তার বাইরে নতুন কিছু বলার থাকলে যোগ করো। প্রতিটি জোড়া/দল এমনভাবে বলবে যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সময় বাঁচে, উপস্থাপন একেইয়ে হয়ে না ওঠে।
- সকল দল/জোড়ার বলা শেষে পাঠ্যবইয়ের ‘গীতার দর্শন’ ছকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গীতার শ্লোকগুলো থেকে সে যা বুঝেছে তা অল্প কথায় লিখতে বলুন। (কাজটি বাড়িতেও করতে দিতে পারেন।)

## ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা যেমন নিজেদের চেষ্টায় গীতার কয়েকটি শ্লোক পাঠ করে গীতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছে, গীতায় এরকম (সাতশত) অনেক শ্লোক আছে।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে গীতার বিষয়বস্তু এবং দর্শন শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

## সহায়ক তথ্য

### শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু

হিন্দুধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এর সংক্ষিপ্ত নাম গীতা। অনেক সময়ই আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে গীতাপাঠ শুনি। বড়রা এমনকি তোমাদের বয়সীরাও কী সুন্দর করে গীতা পাঠ করে। গীতার শ্লোকগুলোর অর্থ শুনলে ভালো লাগে। আমরা অনেক কিছু জানতেও পারি। এসো, আজ আমরা শ্রেণিতেই একটি গীতাপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। শিক্ষকের নির্দেশনার আলোকে নিচের চারটি শ্লোকের যে-কোনো একটি শ্রেণিকক্ষে পাঠ করে সবাইকে শোনাতে হবে। এসো কয়েকবার অনুশীলন করি। তবে সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে পাঠের জন্য শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারি।

<p>১. নিয়তং কুরু কৰ্ম ত্বং কৰ্ম জ্যায়েহ্যকৰ্মণঃ । শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকৰ্মণঃ ॥</p> <p>(গীতা, ৩/৮)</p> <p><b>সরলার্থ:</b> তুমি সর্বদা কাজ করো। কাজ না করার চেয়ে কাজ করা শ্রেষ্ঠ। কাজ না করলে তোমার জীবনযাত্রাও পরিচালিত হবে না</p>	<p>২. রাগদ্বৈষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ । আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥</p> <p>(গীতা ২/৬৪)</p> <p><b>সরলার্থ:</b> সংযতচিত্ত মানুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্রোহ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁর বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবন্ত্তির অনুশীলন করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন।</p>
<p>৩. ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ, প্রণশ্যতি ॥</p> <p>(গীতা, ৪/৩৮)</p> <p><b>সরলার্থ:</b> ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়।</p>	<p>৪. শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ । জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥</p> <p>(গীতা, ৪/৩৯)</p> <p><b>সরলার্থ:</b> যিনি শ্রদ্ধাবান, তৎপর ও সংযত-ইন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করে অচিরেই তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।</p>

আশাকরি তোমরা গীতাপাঠ উপভোগ করেছ। গীতাপাঠ করতে হলে কিছু বিধি মানতে হয়।

### গীতাপাঠ বিধি

আমরা গীতাপাঠ প্রতিযোগিতায় দেখলাম সবাই একইভাবে বা নিয়মে গীতা পাঠ করেনি। আবার অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা পূজায় যেভাবে গীতা পাঠ করা হয়ে থাকে তা স্কুলের অনুষ্ঠানের গীতা পাঠের মত নয়। তবে সব ক্ষেত্রেই কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে গীতা পাঠ করা হয়। সাধারণত গীতা পাঠের শুরুতে বিভিন্ন মঞ্জলাচরণ শ্লোক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল শ্লোক, তার অর্থ ও তাৎপর্যসহ পাঠ, পরিশেষে গীতার মাহাত্ম্য পাঠ ও সব শেষে শান্তিপাঠ করা হয়। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের শুরুতে যখন গীতাপাঠ করা হয় তখন সংক্ষিপ্ত আকারে তা করা হয়ে থাকে। এবার আমরা স্কুলে বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র গীতা পাঠ কীভাবে করি তা জানব। এরপর যেকোনো অনুষ্ঠানে সহজেই গীতাপাঠ করতে পারব।

## বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতাপাঠের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

ধারাবাহিকভাবে এটি অনুসরণ করে গীতাপাঠ সম্পন্ন করতে হবে।

১.	ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
২.	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ-অধ্যায়ের জ্ঞানযোগ থেকে ৩৮ নং শ্লোকটি পাঠ করছি
	শ্রীভগবান্ উবাচ- ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
	সরলার্থ: এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগে সিদ্ধপুরুষ সেই জ্ঞান কালক্রমে নিজের অন্তরে নিজেই লাভ করেন।
৩.	সর্বো ভবন্তু সুখিনঃ সর্বো সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বো ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদুঃখভাগ্ভবেৎ॥
	সরলার্থ: জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক, সকলেই আরোগ্য লাভ করুক, সকল মানুষ পরম শান্তি লাভ করুক, কখনো কেউ যেন কেহ দুঃখ বোধ না করেন।
৪.	ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

এখানে ২ নং অংশে আমরা নিজেদের পছন্দ মত শ্লোক ও তার সরলার্থ পড়তে পারবো।

### শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরিচয়

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের রথের সারথি। যুদ্ধের শুরুতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধ করার প্রেরণা দেন। সেজন্য তিনি কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সেসব উপদেশের সংকলনই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গীতা মহাভারতের একটি অংশ। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (২৫—৪২ অধ্যায়) গীতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রয়েছে। তবুও গুরুত্ব বিবেচনায় মহাভারতের এই অংশটি পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। গীতায় শ্লোকসংখ্যা সাতশত। তাই একে সপ্তশতীও বলা হয়।

## কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ

ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র— দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রমুখ। এঁদের বলা হয় কৌরব। অন্যদিকে পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র— যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। এঁদের বলা হয় পাণ্ডব। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন। তাই বড় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজা হতে পারেননি। তাঁর বদলে রাজা হন ছোট ভাই পাণ্ডু। অতএব, নিয়ম অনুসারে পাণ্ডুর বড় ছেলে যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু কৌরবরা পাশা খেলায় কপটতা করে পাণ্ডবদের পরাজিত করেন। তাঁদের বনবাসে পাঠিয়ে দুর্যোধন অন্যায়ভাবে রাজা হন। বনবাস থেকে ফিরে এসে পাণ্ডবরা নিজেদের রাজ্য ফেরত চান। কিন্তু দুর্যোধন যুদ্ধ ছাড়া রাজ্য ফিরিয়ে দিতে রাজি নন। ফলে হারানো রাজত্ব উদ্ধারের জন্য কুরু-পাণ্ডব দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। অধার্মিক ও দুর্বৃত্তদের বিনাশ এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এই যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয় বলে এর নাম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

## শ্রীমত্তগবদীতার বিষয়বস্তু

শ্রীমত্তগবদীতা মোট আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়কে বলা হয় যোগ। প্রতিটি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। এখানে আমরা গীতার প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানব।

**অর্জুনবিষাদ-যোগ:** কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে প্রতিপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুনের মন বিষাদে ভরে ওঠে। আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা ছাড়া যুদ্ধজয়ের কোনো বিকল্প নেই। তাঁর শরীর কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে যায়। দেহ অবসন্ন হয়। হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ে। এই অবস্থায় তিনি যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেন। ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়েন।

**সাংখ্যযোগ:** সাংখ্য শব্দের অর্থ সম্যক জ্ঞান। সম্যক বিচার-বুদ্ধি। এই অধ্যায় থেকেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান শুরু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে হতাশা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতে উপদেশ দেন। তারপর তিনি অর্জুনের কাছে দেহের নশ্বরতা, আত্মার অবিনশ্বরতা, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, কর্মযোগের প্রারম্ভিক জ্ঞান বর্ণনা করেন। অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

**কর্মযোগ:** নিজের বৃত্তি ও ধর্ম অনুসারে কর্তব্যকর্ম করা, আমি কর্ম করি এই অহংবোধ ত্যাগ করা, জ্ঞানের সাথে কর্ম করা ইত্যাদি কর্মযোগের মূল বিষয়।

**জ্ঞানযোগ:** জ্ঞানের লক্ষণ, জ্ঞান লাভের উপায়, জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি জ্ঞানযোগের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ভগবানের অবতারতত্ত্ব এবং ব্যক্তির গুণ, পেশাভিত্তিক কর্ম সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

**সন্ন্যাসযোগ:** প্রকৃত সন্ন্যাসীর তাৎপর্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ, আমি করি এই অহংবোধ ত্যাগ— এটাই সন্ন্যাসযোগের মূল কথা। সংসারে থেকেও এভাবে প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর চেয়েও গৃহী সন্ন্যাসী উত্তম।

**অভ্যাস বা ধ্যানযোগ:** ধ্যানের উন্নতির জন্য নিয়মিত চর্চা বা অভ্যাস প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে ধ্যানের স্থান, কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করার জন্য নিয়মিত যোগাভ্যাস প্রয়োজন। অন্তর্মুখী ব্যক্তি মহাদুঃখেও বিচলিত হন না। সর্বভূতে পরমাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তিনি পরমানন্দ লাভ করেন। এসব বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে।

**জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ:** অপরা ও পরা ভেদে প্রকৃতি দুই প্রকার। পঞ্চভূতের সাথে মন, বুদ্ধি ও অহংকার যোগ হয়ে

অপরা প্রকৃতি সৃষ্টি হয়। আবার জীবের মধ্যে স্থিত চেতনপুরুষই পরাপ্রকৃতি। অপরা ও পরা মিলেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। এটাই জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগের বিষয়বস্তু।

**অক্ষরব্রহ্ম-যোগ:** ক্ষর অর্থ বিনাশ। অক্ষর মানে অবিনাশ। পরমেশ্বরের নির্গুণভাবই অক্ষর। তিনিই নিরাকার ব্রহ্ম। এখানে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্মের উপাসনা এবং ব্রহ্মচিন্তার ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহী করতে এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে।

**রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ:** রাজবিদ্যা অর্থ শ্রেষ্ঠবিদ্যা এবং রাজগুহ্য অর্থ শ্রেষ্ঠ রহস্যময় বিদ্যা। শ্রেষ্ঠ ও রহস্যময় বিদ্যাই এই যোগের আলোচ্য বিষয়। পরমেশ্বর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণে বশীভূত নন। ঐকে বলা হয় নির্গুণ ব্রহ্ম। আবার ভক্তের জন্য তিনি গুণের দ্বারা বশীভূত হন। তাঁকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম। সেক্ষেত্রে তিনিই স্রষ্টা, তিনি সৃষ্টি। তিনিই কর্মকর্তা, তিনিই কর্মফলদাতা। পত্র-পুষ্প-ফলে, জলে ভক্তিসহকারে ভজনার দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায়। ভগবানের সেই উদার ও সর্বজনীন রূপ এখানে আলোচিত হয়েছে।

**বিভূতিযোগ:** বিভূতি শব্দের অর্থ মহিমাময় রূপ, বিবিধ সৃষ্টি। প্রকৃতির মাঝে পরমেশ্বর যে-রূপে বিরাজমান তাই তাঁর বিভূতি। গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বাতাস সবকিছুর মধ্যে তিনি রয়েছেন। দৃশ্যমান জগৎ তাঁর একটি অংশমাত্র। তাঁর পূর্ণ মহিমা অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়।

**বিশ্বরূপদর্শন-যোগ:** বিশ্বরূপের অর্থ ভগবানের ঐশ্বরিক রূপ। তাঁর অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত চরণ। তাঁর আদি, অন্ত বা মধ্য নেই। স্থাবর-অস্থাবর, দেব-দানব জগতের সবকিছুই তাঁর মধ্যে রয়েছে। অর্জুন এসব দেখে ভীত হয়ে ভগবানকে সৌম্য মনুষ্যরূপ ধারণ করার জন্য প্রার্থনা করেন।

**ভক্তিযোগ:** ভগবানের প্রতি ভক্তের আন্তরিক ভালোবাসাই ভক্তি। ভক্তের কাছে তিনি সাকার রূপে আবির্ভূত হন। যিনি সকল জীবপ্রকৃতিকে ভালোবাসেন, দয়া করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব। এগুলো ভক্তিযোগের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

**ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ:** ক্ষেত্র অর্থ জমি। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ জমি সম্পর্কে যিনি জানেন। সুখ-দুঃখের অনুভূতিযুক্ত শরীরই ক্ষেত্র এবং পরমেশ্বরই এর ক্ষেত্রজ্ঞ। এই জ্ঞান লাভ করলে অবিদ্যা নাশ হয়। মোক্ষ লাভ হয়।

**গুণত্রয়-বিভাগযোগ:** এখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন গুণের বৈশিষ্ট্য, গুণকর্তৃক আত্মার বন্ধনপ্রক্রিয়া, ত্রিগুণাতীতের বৈশিষ্ট্য, ভক্তকর্তৃক গুণকে অতিক্রম ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**পুরুষোত্তম-যোগ:** এখানে পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম পুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। জীবপ্রকৃতির মধ্যে স্থিত পরিণামী পুরুষকে বলা হয় ক্ষরপুরুষ। আবার, নির্গুণ ব্রহ্মই অবিনাশী অক্ষর পুরুষ। ক্ষর ও অক্ষরের উর্ধ্বে যে পুরুষ তিনি পুরুষোত্তম। মোহমুক্ত হয়ে সেই পুরুষোত্তমের ভজনায় সর্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব।

**দৈবাসুরসম্পদ-বিভাগযোগ:** দৈবিক ও আসুরিক ভাব সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। নির্ভীকতা, চিন্তাশুদ্ধি, সংযম, দান, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য, শুচিতা ইত্যাদি দৈবী ভাব। দম্ভ, অহংকার, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি আসুরিক ভাব।

**শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ:** শ্রদ্ধা অর্থ বিশ্বাস বা আস্থা। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে শ্রদ্ধা তিন প্রকার। অনুরূপভাবে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান— প্রতিটি তিনভাগে বিভক্ত। এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধা, আহার, দানাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক দান অনুশীলনের জন্য অর্জুনকে এখানে উপদেশ

দেওয়া হয়েছে।

**মোক্ষযোগ:** মোক্ষ অর্থ মুক্তি। ভগবানকে পাওয়ার মাধ্যমে মোক্ষ লাভ হয়। কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণ নিলেই ভক্তের মোক্ষলাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনে ভক্ত অর্জুনের মোক্ষ লাভ হয়েছিল। তিনি সংশয়শূন্য মনে ধর্মযুদ্ধ করতে সম্মত হন—এসব বিষয় এখানে বলা হয়েছে।

- শিক্ষার্থীদের ভালো লেগেছে— গীতার এরকম পাঁচটি যোগের নাম ও কীভাবে সেগুলো তার জীবনে কাজে লাগবে তা লিখে ‘গীতায়োগ’ ছকটি এককভাবে পূরণ করতে বলুন।
- গীতার যোগের এই অংশটি বিমূর্ত ধারণা নিয়ে গঠিত বলে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতায় আনতে যতটা সম্ভব সহজ করে, বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন। আপনার নিজের মধ্যে কোনো সংশয়/ অস্পষ্টতা থাকলেও তা দূর করাতে সচেষ্ট হবেন।

### গীতার দর্শন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে একটি দর্শন রয়েছে। যার প্রতিটি বিষয় মানবজীবনের জন্য অনুসরণীয়। সেসবের মধ্যে থেকে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো:

**হতাশা বর্জন:** আশাই জীবনের চালিকাশক্তি। আশাবাদী মানুষ বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে হতাশাগ্রস্ত মানুষ কাজের শুরুতেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। যার ফলে সে ব্যর্থ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে যুদ্ধের শুরুতেই বিমর্ষভাব ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে বলেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতদ্ব্যুপপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

(গীতা, ২/৩)

**সরলার্থ:** হে পার্থ, কাতর হয়ে না, এই কাপুরষতা তোমার শোভা পায় না। তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াও।

**কর্মযোগের অনুশীলন:** কর্মই জীবন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে কাজ করে যেতে হয়। কাজ না করে জীবন কাটানো সম্ভব নয়। কিন্তু কর্ম করলে মানুষকে ফলভোগ করতে হয়। ভালো কাজের জন্য ভালো ফল। মন্দ কাজের জন্য মন্দ ফল। এক্ষেত্রে গীতার দর্শন হচ্ছে কর্মবিমুক্ত না হয়ে, কর্মের প্রতি মোহগ্রস্ত না হয়ে, কর্মফল ইন্দ্রের অর্পণ করে কাজ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঞ্জোহস্বকর্মণি।

(গীতা, ২/৪৭)

**সরলার্থ:** কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও নয়। কর্মফল লাভের আশায় তুমি কর্ম করো না, আবার



কর্ম ত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

গীতার পরিভাষায় এধরনের কর্মকে বলে নিষ্কাম কর্ম। যার অনুশীলনে মানুষকে মোহগ্রস্ত হতে হয় না। কোনো দুঃখকষ্টও তাকে ভোগ করতে হয় না।

**প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন:** যা দ্বারা কোনো কিছু জানা যায় তাই জ্ঞান। জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে পৃথিবীর উন্নতি হয়েছে। জ্ঞানের মাধ্যমেই জীবন আলোকিত হয়। ভ্রান্ত জ্ঞানে জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। একজন প্রকৃত জ্ঞানীই নিষ্কামকর্মের অনুশীলন করতে পারেন। মূঢ় বা অজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগী হওয়া সম্ভব নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।

(গীতা, ৪/৩৮)

**সরলার্থ:** এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগে সিদ্ধপুরুষ সেই জ্ঞান কালক্রমে নিজের অন্তরে নিজেই লাভ করেন।

**স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া:** অশান্ত মনে কোনো জটিল বিষয়ের সমাধান হয় না। উল্টো সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়। সমাধানের জন্য প্রয়োজন শান্ত মন। শান্ত মনের মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। গীতার পরিভাষায় ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রিত সংযমী শান্ত মনের মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়েছে। ‘যাঁর দুঃখে উদ্বেগ নেই, সুখের প্রতি স্পৃহা নেই, কাজের প্রতি যাঁর মোহ নেই, ক্রোধ বা বিশেষ ভীতি নেই তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ’। (গীতা, ২/৫৬) অতএব, সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে উঠে মোহশূন্য শান্ত মনে কাজের জন্য এবং সঠিক সমাধানের জন্য মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হবে।

**মানবচরিত্রের উন্নয়ন:** মানুষের চরিত্র কতগুলো বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। গীতার পরিভাষায় যাকে গুণ বলা হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ভেদে তা তিন প্রকার। সত্ত্ব গুণ হলো সেই গুণ যা মানুষকে নির্মল সুখের অনুভূতি দেয়, সৃজনশীল করে, সঠিক চিন্তাভাবনা করতে সাহায্য করে। যা মানুষকে চঞ্চল করে, রাগ বাড়িয়ে দেয়, উত্তেজনা সৃষ্টি করে- তা রজঃ গুণ। যা মোহ সৃষ্টি করে, আলস্য বাড়িয়ে দেয়, ভ্রান্তি বাড়িয়ে দেয়- তা তমঃ গুণ।

যে-গুণের আধিক্য বেশি, ব্যক্তির চরিত্রে সেই বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়। একজন ভালো মানুষের সবকিছু ভালো, খারাপ মানুষের সবকিছু খারাপ- এমনটি নয়। নিজের সহপাঠী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বিরূপ আচরণকে এই দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে কোনো ক্ষোভ বা অস্বস্তি থাকে না। নিয়মিত সংস্কার, সংকাজের সাথে যুক্ত থাকার মাধ্যমে গুণের পরিবর্তন করা সম্ভব। তমঃ থেকে রজঃ বা রজঃ থেকে সত্ত্ব গুণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন করা সম্ভব। এই দর্শনকে অনুসরণ করে মানুষ তার চরিত্রের উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

**সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি:** ঈশ্বর আত্মারূপে সর্বভূতে বিরাজমান। গাছ-পালা, জীবজন্তু প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। গীতার ভাষায়, “সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ” (গীতা ১৫/১৫) — আমি সকল জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করি। কিন্তু ভ্রান্তদর্শী জীব তা উপলব্ধি করতে পারে না। এই দর্শন ধারণ করে সর্বজীবের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করা যায়। ফলে মনের হিংসা ও পারস্পরিক বিভেদ লোপ পায়। প্রকৃতির গাছপালা, পশুপাখি সবার প্রতি হৃদয়ে ভালোবাসা জন্মে। এতে বিশ্বজগতের কল্যাণ হয়।

**পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি:** প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে। যেমন দুধ থেকে দধি তৈরি হয়। এখানে দুধ, চিনি, পাত্র, আগুন, কারিগর ইত্যাদি দধি সৃষ্টির কারণ। জগৎ সৃষ্টির মূল কারণই ঈশ্বর। পরমেশ্বর নিরাকার হলেও ভক্তের কাছে তিনি সাকার রূপে আবির্ভূত হন। ভগবানের প্রতি ভক্তের যে ভালোবাসা তাই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের ভাষায়, ‘পত্র, পুষ্প, ফল, জলসহ যে ভক্ত কামনাশূন্য হয়ে ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করে আমি তাঁর উপহার গ্রহণ করি’। (গীতা, ৯/২৬) অতএব, ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করে পরম প্রশান্তি পাওয়া যায়।

- গীতা অনুসারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের যেসব বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যমান তা পাঠ্য-বইয়ের ‘আমার বৈশিষ্ট্য’ ছকে এককভাবে লিখতে বলুন।
- গীতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর যে উপদেশগুলো শিক্ষার্থীরা পেয়েছে, তার মধ্য থেকে তাদের পছন্দের তিনটি ‘গীতামৃত’ ছকে এককভাবে লিখে রাখতে বলুন।

### শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একখানি অমূল্যগ্রন্থ। হিন্দুধর্মানুসারী মানুষের কাছে এর বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কারণ গীতায় কর্ম ও জ্ঞানের সাথে ভক্তির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ভক্তির মাধ্যমেও ভগবানকে পাওয়া যায়। সেই পথের সন্ধান গীতায় দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। গীতার প্রথম কথা—কর্তব্যকর্মের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করা। কিন্তু কর্ম করলে জীবকে তার ফল ভোগ করতে হয়। এই অবস্থায় কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে কর্ম করে যাওয়াই গীতার উপদেশ। কর্মযোগের ভাষায় এ ধরনের আসক্তিশূন্য কর্মকে বলা হয় নিষ্কাম কর্ম। কিন্তু একজন অজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞানীর পক্ষে নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন সম্ভব নয়। জ্ঞান জাগরিত হলে ভ্রান্তজ্ঞান বিদূরিত হয়। তখন তিনি কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে নিষ্কাম কর্ম করতে পারেন। জ্ঞানযোগের মতে, ঈশ্বরই কর্মফলের বিধাতা। তিনি অব্যয়, অক্ষয়, নিরাকার পরমব্রহ্ম, পুরুষোত্তম। প্রতিটি জীবের মধ্যে তিনি আত্মরূপে বিরাজ করেন। এই আত্মা জন্মে না, মরে না। অস্ত্র দিয়ে ঐকে বিন্ধ করা যায় না, আগুন দিয়ে পোড়ানো যায় না। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা অবিনশ্বর। এই জ্ঞান জাগরিত হলে জীবের মধ্যে অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তদর্শন থাকে না। তিনি প্রকৃত নিষ্কাম কর্মের অনুশীলনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

কিন্তু ভ্রান্তদর্শী জীবের মনে প্রকৃত জ্ঞান জাগরিত হয় না। কী উচিত, কী অনুচিত— তা তিনি বুঝতে পারেন না। ফলে প্রকৃত সত্য নির্ধারণে ব্যর্থ জীব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে হতাশাগ্রস্ত বা বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কুবুদ্ধি যুদ্ধে হতাশাগ্রস্ত অর্জুন তারই একটি প্রতীকী চরিত্র মাত্র। যুগে-যুগে, দেশে-দেশে, সমাজজীবনে, পারিবারিক জীবনে যুদ্ধ সর্বদা চলছে। এমনকি ব্যক্তির নিজের অন্তরের মধ্যেও যুদ্ধ চলমান। এই যুদ্ধ সুর-অসুর, সুন্দর-অসুন্দর, শুভ-অশুভের মধ্যে। এই অবস্থায় প্রকৃত কর্তব্য নির্ধারণের জন্য, সর্বোপরি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একজন প্রকৃত পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পথপ্রদর্শক। তিনি অর্জুনকে কর্মযোগের আলোচনার পরই জ্ঞানের কথা বলেছেন।

কর্ম ও জ্ঞানের পাশাপাশি ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। ভগবানের প্রতি ভক্তের আন্তরিক ভালবাসাই ভক্তি। জগতের সার্বিক ভালোবাসা বা আন্তরিক টানের উর্ধ্বে ভক্তির অবস্থান। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, তপ্তি রনচোবগভ লহে নাট করন্তিআ মতঠনঘি কথে রাত সাবলাভ য়ে ব্রক্ষে কর্ব্বাসি দ্যিত্তই তর্পিপ্র-নজয়প্রি নর্শদ রাতিগ। ভক্তি রক্তভে অনুসারে পরমব্রহ্ম নিরাকার হলেও ভক্তের আত্মানে তিনি সাকার রূপে আবির্ভূত হন।

ভগবানের এই সাকার রূপের প্রমাণ দিতে গিয়ে গীতার অবতারতত্ত্বের প্রসঙ্গ এসেছে। অবতার অর্থ ভগবানের মনুষ্যরূপে জন্ম নেওয়া, অবতীর্ণ হওয়া। যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে, ভগবান তখন দুষ্টির দমন, শিষ্টের পালন তথা ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হন। অবতার পুরুষের আবির্ভাবের বাইরে ভক্তের প্রার্থনা-অনসারে যে কোন রূপে তিনি ভক্তের কাছে ধরা দেন। গীতার বিশ্বরূপদর্শন যোগে তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। ভক্ত অর্জুনের প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। আবার সৌম্যশান্ত সখা রূপেও তার কাছে ফিরে এসেছেন।

কর্ম ও জ্ঞানমার্গের উর্ধ্বে এই ভক্তিমার্গ অবস্থান। এখানে ভক্তের সার্বিক দায়িত্ব ভগবানেরই। ভগবান বলেছেন—  
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শূচঃ ॥ (গীতা, ১৮/৬৬)

(সকল ধর্মাচরণ ত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করবো। শোক কর না।)

ভক্তের কাছে ভগবানের এধরণের প্রতিশ্রুতি ও ভক্তের সর্বোত্তম প্রাপ্তি আর কী হতে পারে!

কর্ম ও জ্ঞানযোগের পাশাপাশি ভক্তিমার্গের কথা তুলে ধরার কারণে গীতা তাই একটি অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জীবনযুদ্ধে উপস্থিত মানুষ এর বাণীকে অনুসরণ করে সার্বিক সমস্যার সমাধান পেতে পারে। এই সমাধান কর্মের পথে, জ্ঞানের পথে অথবা ভক্তের ভক্তির মাধ্যমে। এই স্বাতন্ত্র্যই গীতাকে আজ হিন্দু-ধর্মানুসারী-সহ সারা বিশ্বের আলোকিত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

## ধাপ-৪: সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীরা গীতার বিষয়বস্তু থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশগুলো পেয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করে সংলাপ লিখে দলীয়ভাবে একটি নাটিকা তৈরি করে উপস্থাপন করতে বলুন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীরা নাটিকাটি থেকে জীবনে প্রয়োগ করার মতো কী বিষয় পেয়েছে তা পাঠ্যবইয়ের ‘জীবনোপদেশ’ ছকে লিখতে বলুন। (বাড়ির কাজ হিসেবেও দিতে পারেন।)

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### যোগ্যতা ৮.১

- হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।

### শিখন অভিজ্ঞতা ৩: যোগাসন

- এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে—
- যোগাসন অনুশীলন
- যোগাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি
- যোগাসন চর্চার মাধ্যমে শরীর ও মনের উন্নয়ন

### বিষয়বস্তু

অষ্টাঙ্গযোগ, সুখাসন, হলাসন, ভূজঙ্গাসন

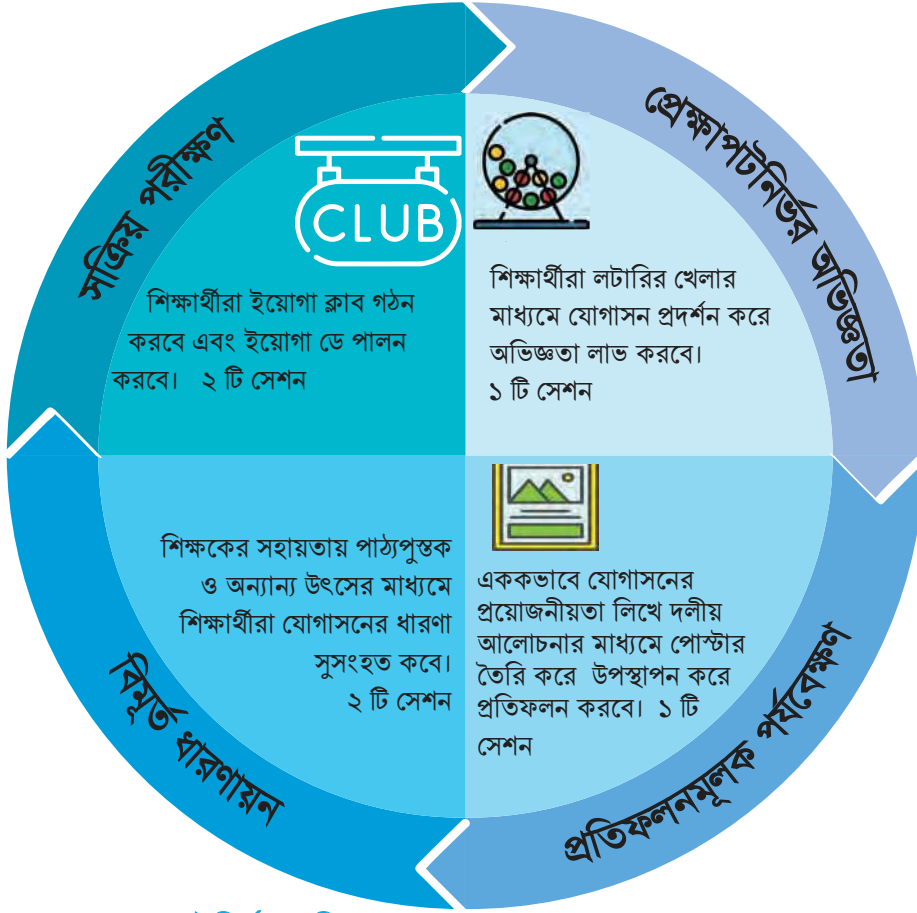
### অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা দল/ জোড়ায় ভাগ হয়ে লটারির খেলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে যোগাসন প্রদর্শন করবে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে এককভাবে যোগাসনের উপকারিতা সম্বন্ধে লিখবে। দলের সবার লেখা একত্রিত করে ছবিসহ পোস্টার তৈরি করে প্রদর্শন করবে। শিক্ষার্থী সতীর্থদের উপস্থাপনা মূল্যায়ন করবে। শিক্ষক ব্যবহারিক কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও পাঠ্যবইয়ে দেওয়া কাজগুলোর মাধ্যমে যোগাসন সম্পর্কে ধারণা দেবেন। ধ্যান, সুখাসন, হলাসন, ভূজঙ্গাসন করবার পদ্ধতি হাতে-কলমে শিখিয়ে দেবেন।

শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দল/ জোড়া এক/ একাধিক যোগাসন করে দেখাবে। প্রতিটি দল/ জোড়া যোগাসন সম্পর্কে এক মিনিট করে বক্তৃতা দেবে। শিক্ষার্থীরা একটি ‘ইয়োগা/ যোগাসন ক্লাব’ গঠন করবে। ইয়োগা ডে পালন করে ইয়োগা ক্যাম্প পরিচালনা করবে। এ বিষয়ক কর্মসূচির পরিকল্পনা করবে।

### বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৬ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।



### ধাপ-১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা সেশন ১ টি

- সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন যে তারা আগের শ্রেণিগুলোতে যোগাসনের চর্চা করেছে, কেউ কেউ হয়ত নিয়মিত বা মাঝে মাঝে চর্চাও করে, কাউকে করতে দেখেছে বা টেলিভিশনেও দেখে থাকতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের একাধিক দল/জোড়ায় ভাগ হতে সাহায্য করুন। তাদের বলুন, আমরা এখন যোগাসনের খেলা খেলব।
- দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজেদের জানা একটি করে যোগাসনের নাম টুকরো কাগজে লিখতে বলুন।
- এরপর লটারির মাধ্যমে দলের প্রত্যেকে একটি করে কাগজ তুলবে। যে আসনের নাম আসবে সেটি দলীয়ভাবে করে দেখাবে। না দেখাতে পারলে দলটি পয়েন্ট পাবে না। অন্য যে দল দেখাতে পারবে তারা পয়েন্ট পাবে।
- বোর্ডে পয়েন্টের হিসাব রাখতে দিন।
- তাদের বলুন, তোমরা চমৎকারভাবে যোগাসন প্রদর্শন করেছ! বিজয়ী এবং বিজিত দলকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।
- শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অন্তত তিন-চারটি যোগাসন প্রদর্শনের চেষ্টা করুন।

## ধাপ-২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়াকে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এককভাবে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট ছকে যোগাসনের উপকারিতা সম্বন্ধে লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীরা যদি বুঝতে অসুবিধা বোধ করে তাহলে জানান যে, যোগাসন করলে শরীরের ব্যায়াম হয়, মন ভালো থাকে। তাদের লক্ষ্য করতে বলুন, বিভিন্ন আসন করলে শরীরের কোথায় কোথায় চাপ লাগে। তাদের জানান, শরীরের এই অংশগুলো যোগাসনের ফলে ভালো থাকে। এরচেয়ে বেশি সাহায্য করবার প্রয়োজন নেই।
- প্রতিটি দল/ জোড়ার লেখাগুলো একত্র করে এক বা একাধিক পোস্টার পেপারে/ বড় আকারের কাগজে ছবিসহ লিখে পোস্টার তৈরি করতে দিন।
- পোস্টার তৈরি হলে প্রতিটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের ‘উপস্থাপনা যাচাই তালিকা’ পূরণ করতে দিন। (সকলের পাঠ্যবই থেকে মূল্যায়নের মান সংগ্রহ করে আপনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন)
- উপস্থাপন শেষে পোস্টারগুলো শ্রেণিকক্ষে সাঁটিয়ে রাখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের কাজের প্রশংসা করুন এবং বলুন, তোমরা চমৎকারভাবে লিখে যোগব্যায়ামের উপকারিতা উপস্থাপন করেছ! আরও ভালো হবে যদি তোমরা আরও কিছু ব্যায়াম শেখার চেষ্টা করো এবং সেগুলোর চর্চা করো।

## ধাপ-৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের পদ্মাসন/ সুখাসনে বসে সাউন্ড সিস্টেম/ মুঠোফোন ব্যবহার করে ‘ওঁ’ তথা বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে ৩-৪ মিনিট ধ্যান/ মেডিটেশন করতে দিন।
- সাউন্ড সিস্টেম না থাকলে বোর্ডে একটি বিন্দু ঐকে (বিন্দু ট্রাটক)/ একটি মোম জ্বালিয়ে (অগ্নি ট্রাটক) তার ওপর নিবিড় মনোযোগে দৃষ্টি রাখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা কয়েকটি যোগাসন দেখলাম, যোগাসনে উপকারিতা সম্পর্কেও জানলাম। চলো, যোগাসন সম্পর্কে আরও কিছু কথা জেনে নিই। নতুন তিনটি যোগাসন পদ্ধতিও শিখে নিই।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও পাঠ্যবইয়ে দেওয়া কাজগুলোর মাধ্যমে অষ্টাঙ্গযোগ ও যোগাসন সম্পর্কে ধারণা দিন। সুখাসন, পশ্চিমোত্তাসন, ভূজঙ্গাসন করবার পদ্ধতি শিখিয়ে দিন।
- আসনগুলো সহজবোধ্য করা এবং পাঠে বৈচিত্র্য আনবার জন্য আপনি পুতুল ব্যবহার করে যোগাসন দেখিয়ে দিতে পারেন/ আগ্রহী শিক্ষার্থীকে সামনে ডেকে তার সাহায্য নিয়েও দেখাতে পারেন/ আপনি নিজেও করে দেখাতে পারেন।
- মনে রাখবেন, যোগাসন একটি ব্যবহারিক বিষয়। এই পাঠে আপনার লক্ষ্য থাকবে, শিক্ষার্থী যেন তার এই শিক্ষাকে জীবনব্যাপী ব্যবহার করে। তাই শ্রেণির কাজ এবং আপনার বলার মাধ্যমে সেই উদ্দীপনা তৈরি করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি যদি নিজের যোগব্যায়াম অনুশীলনের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতে পারেন।

## সহায়ক তথ্য

এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নীরবে যে যার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে চলেছে। সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবী, পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তন করছে চন্দ্র। দূর আকাশের চাঁদের টানে পৃথিবীর নদীতে জোয়ার-ভাটা আসে। চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান বদলের কারণে চাঁদ- সূর্যে গ্রহণ হয়। আমরাও এই বিশ্ব ব্রহ্মা- ণ্ডের অবিচ্ছিন্ন অংশ, একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত আছি। এই সম্পর্ককে অনুভব করার জন্য প্রয়োজন আত্মমগ্ন হওয়া। আত্মমগ্নতায় পরমব্রহ্মের জীবাত্মা রূপের উপলব্ধি আসে। এই আত্মমগ্নতা উপলব্ধি করার একটি মাধ্যম হলো যোগাসন।

স্বামী পরমানন্দ বলেছেন, “বাইরে খুঁজলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না, তিনি মানুষের অন্তরে তত্ত্বরূপে বিরাজমান, নিজের ভেতরে তাঁকে প্রকাশ করার নামই সাধনা।”

বৈদিক নিয়মে বিভিন্ন যোগাসনের মাধ্যমে আত্মমগ্ন হওয়া যায়। যোগাসন আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে। এই যোগাসনের ধারণা বহু প্রাচীন। আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কে বিশদভাবে লেখা আছে। যোগাসন বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের অষ্টাঙ্গযোগ সম্পর্কে জানতে হবে। অষ্টাঙ্গযোগের একটি ধাপ হলো যোগাসন।



- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ‘যোগ-পরিক্রমা’ ছকে কয়েকটি যোগাসনের নাম ও উপকারিতা লিখে দল/জোড়ায় উপস্থাপন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের ‘উপস্থাপনা যাচাই’ তালিকা ব্যবহার করে অন্য দল/জোড়ার উপস্থাপনা মূল্যায়ন করতে বলুন।

যোগাসনের জন্য মনঃসংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা উপরের ছবির মতো বিন্দুর দিকে তাকিয়ে এবং একইভাবে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে মনঃসংযোগ করতে পারি। এ কাজকে বিন্দু ট্রাটক ও অগ্নি ট্রাটক বলে। এতে মনে স্থিরতা আসে। সহজে আত্মমগ্ন হওয়া যায়।

### অষ্টাঙ্গযোগ

মহর্ষি পতঞ্জলি ১৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যোগের তত্ত্ব ও অনুশীলনের উপর কিছু সূত্র দেন। একে যোগসূত্র বলে। যোগ-সূত্রে অষ্টাঙ্গযোগের কথা বলা হয়েছে। অষ্টাঙ্গযোগে আটটি ধাপ রয়েছে। নিচে ধাপগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

**১। যম:** যম অর্থ সংযম। ইন্দ্রিয় এবং মনকে হিংসা, অশুভ ভাব থেকে সরিয়ে আত্মকেন্দ্রিক করা। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বস্তু ত্যাগ করা। যম পাঁচ ধরনের—

**(ক) অহিংসা—** সব সময় নিজের ভেতরে বিদ্রোহীনা চিন্তা ও চেষ্টা ধারণ করা। এককথায় মনকে ভালোবাসা পূর্ণ রাখা। শুধু জীবের প্রতি ভালোবাসা নয়, নিখিল বিশ্বের তথা প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা।

**(খ) সত্য—** যেমন দেখেছি, যেমন শুনেছি এবং যেমন জেনেছি, ঠিক তেমনটাই মনে, কথায় ও কাজে করাকে সত্য বলে। মন যদি সত্য চিন্তা করে, জিহ্বা যদি সত্য কথা বলে এবং সমগ্র জীবন যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

**(গ) অস্তেয়—** অস্তেয় অর্থ চুরি না করা। অপরের জিনিস না বলে অধিকার করাকে স্তেয় (চুরি) বলে।

**(ঘ) ব্রহ্মচর্য—** ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ ও পবিত্র সংযত জীবনযাপন করা। জীবনে ব্রহ্মচর্যকে প্রতিষ্ঠা করলে দেহে শক্তি মেলে। মনে সাহস ও বুদ্ধি বিকশিত হয়।

**(ঙ) অপরিগ্রহ—** অপরিগ্রহ অর্থ হচ্ছে অগ্রহণ বা মুক্ত থাকা। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহ, মজুত বা ভোগের লিপ্সা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

**২। নিয়ম:** যার মাধ্যমে ব্যক্তি তাঁর অন্তর্গত শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের চর্চার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি করে তা-ই নিয়ম। মহর্ষি পতঞ্জলি শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন।

**(ক) শৌচ—** শৌচ বলে শুদ্ধতা তথা পবিত্রতাকে। শৌচ দুই রকমের: বাইরের এবং ভেতরের। সাধকের প্রতি-দিন জল দ্বারা শরীর শুদ্ধি, সত্যচরণ দ্বারা মনের শুদ্ধি, বিদ্যা আর তপস্যা দ্বারা আত্মার শুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি প্রয়োজন।

**(খ) সন্তোষ —** সন্তোষ মানে সম্যক পরিতৃপ্তি। যখন যে অবস্থায় থাকা যায় সে অবস্থাকে সুখকর মনে করে আনন্দময় জীবন যাপন করা।

(গ) তপঃ - তপঃ মানে আত্ম-সংযম। এর মাধ্যমে দেহ-মন ও বাক্যে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা প্রদর্শন করা হয়।

(ঘ) স্বাধ্যায়- স্বাধ্যায় হচ্ছে আত্মোন্নয়নে সহায়তাকারী ও অনুপ্রেরণাদায়ী প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি থেকে পাঠ গ্রহণ করা। কেননা শিক্ষা ও অধ্যয়নই পারে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ করে গড়ে তুলতে।

(ঙ) ঈশ্বর-প্রণিধান- প্রণিধান অর্থ অর্পণ। সমস্ত কর্ম ও ইচ্ছা ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান।

৩। আসন— আসন অর্থ স্থির হয়ে সুখে অধিষ্ঠিত থাকা। দেহমনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি তা-ই আসন।

৪। প্রাণায়াম— প্রাণায়াম অর্থ প্রাণের আয়াম। প্রাণ হলো শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু আর আয়াম হলো বিস্তার। সুতরাং প্রাণায়াম বলতে বোঝায় শ্বাস-প্রশ্বাসের বিস্তার। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। রেচক, পূরক ও কুম্ভক-এই তিন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাণায়াম সম্পন্ন হয়। শ্বাস গ্রহণকে বলে পূরক, শ্বাসত্যাগকে বলে রেচক এবং শ্বাস ধারণকে বলে কুম্ভক।

৫। প্রত্যাহার— প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া। বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে ভিতরের দিকে ফিরিয়ে নেওয়াই প্রত্যাহার।

৬। ধারণা— মনকে বিশেষ কোনো বিষয়ে স্থির করা বা আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা। ধারণা অর্থ একাগ্রতা। নিজ দেহের অঙ্গবিশেষে যেমন- নাভি, নাকের অগ্রভাগ বা ভ্রু- যুগলের মধ্যস্থানে অথবা কোনো দেবমূর্তি বা যে কোনো বস্তুতে মনকে নিবিষ্ট করা যেতে পারে।

৭। ধ্যান বা মেডিটেশন— ধ্যান অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা। নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করলে মন একসময় ঈশ্বরময় হয়ে ওঠে। ধ্যানে যোগীর দেহ শ্বাস-প্রশ্বাস ইন্দ্রিয় মন বিচারশক্তি অহংকার সবকিছু ঈশ্বরে লীন হয়ে যায়। তিনি এমন এক সচেতন অতীন্দ্রিয় অবস্থায় চলে যান যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন পরম আনন্দ ছাড়া তাঁর আর কোনো অনুভূতি হয় না। তিনি তাঁর আপন অন্তরের আলোও দেখতে পান।

৮। সমাধি— সমাধি অর্থ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত তথা হৃদয় সমর্পণ। এই সমর্পণের মাধ্যমে মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। তখন তাঁর ‘আমি’ বা ‘আমার’ জ্ঞান থাকে না। কারণ তখন তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধি স্তব্ধ থাকে। সাধক তখন প্রকৃত যোগ লাভ করেন।

জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার এক পরম আনন্দময় মিলনই সমাধি অবস্থা। সমাধি দুই প্রকার, যথা: সর্বিকল্প এবং নির্বিকল্প। সাধকের ধ্যানের বস্তু ও নিজের মধ্যে পার্থক্যের অনুভূতি থাকলে, তা হলো সর্বিকল্প সমাধি। আর সাধক যখন ধ্যানের বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান সে অবস্থাই হলো নির্বিকল্প সমাধি। এই সমাধি লাভ যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর, যোগীর পরম প্রাপ্তি।

- শিক্ষার্থীদের অষ্টাঙ্গাযোগ কীভাবে তাদের জন্য কল্যাণকর তা ‘প্রাণবায়ু’ বেলুনে পাঁচটি পয়েন্টে একক-ভাবে লিখতে বলুন।

## যোগাসন

অষ্টাঙ্গাযোগের একটি ধাপ হলো আসন বা যোগাসন। যোগ শব্দের অর্থ সংযোগ আর আসন শব্দের অর্থ উপবেশন করা। ঘেরঙসংহিতা মতে, মহাদেব চুরাশি লক্ষ আসনের কথা বলেছেন। তবে এর ভিতর ষোল শত আসন উৎকৃষ্ট।

বর্তমানে যোগাসনকে মূলত দু’টিভাগে ভাগ করা হয়— ধ্যানাসন ও স্বাস্থ্যাসন। ধ্যানাসনের সংখ্যা ২৮ টি, স্বাস্থ্যাসনের সংখ্যা ৫৬ টি। সব মিলিয়ে মোট আসন সংখ্যা ৮৪ টি। এরমধ্যে ৩২ টি আসন মানুষের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। যোগশাস্ত্রে প্রতিটি আসনেরই নাম রয়েছে। এই নামের সঙ্গে আসন যুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়। যেমন— ‘শব’ নামের আসনটিকে উল্লেখ করা হয়েছে শবাসন (শব+আসন) নামে।

## সুখাসন

সুখ শব্দের সাধারণ অর্থ হলো— হর্ষ, আনন্দ, প্রীতি, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি, তৃপ্তি ইত্যাদি। স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় এমন ভাবগত অর্থ থেকে এই আসনের নামকরণ করা হয়েছে সুখাসন (সুখ + আসন)।

## পদ্ধতি

১. কোন সমতল স্থানে, মেরুদণ্ড সোজা করে, দুই পা ছড়িয়ে বসতে হবে।
২. এবার ডান পা ভাঁজ করে বাম উরুর দিকে নিয়ে আসতে হবে।
৩. বাম পা ভাঁজ করে ভাঁজ করা ডান পায়ের নিচ থেকে বাম উরুর কাছে আনতে হবে।
৪. এবার ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপরে রাখতে হবে।
৫. হাতের তালু থাকবে হাঁটুর দিকে ফেরানো এবং আঙুলগুলো হাঁটুর উপর ছড়ানো থাকবে।
৬. শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এক মিনিট অবস্থান করতে হবে।
৭. তারপর পা বদল করে একই প্রক্রিয়ায় আসনটি করতে হবে।
৮. সর্বশেষে আসন ত্যাগ করে শবাসনে এক মিনিট বিশ্রাম নিতে হবে।

পুরো আসনটি মোট তিন বার করতে হবে।

## উপকারিতা

- ১। মনের একাগ্রতা, মনঃসংযোগ ও মনের স্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
- ২। ধ্যান ও প্রাণায়ামে এ আসন খুবই উপযোগী। মনের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে মনকে নিবিড়ভাবে এই আসন প্রশান্ত করে তোলে।

৩। মানসিক উদ্বেগ, অনিদ্রা, ক্ষুধা ও বিষণ্ণতা দূর করে।

৪। পিঠের ব্যথা উপশম ও মেরুদণ্ড সবল হয়।

৫। পেটের পেশী সবল, পরিপাকতন্ত্রের উন্নতি ও দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে।

৬। হাঁটুর নমনীয়তা বাড়ে। ফলে হাঁটু মুড়ে যাঁরা বসতে কষ্ট পান, তাঁদের অসুবিধা দূর হয়। এছাড়া হাঁটুর ব্যথা দূর হয়।

৭। পায়ের পাতা প্রসারিত হয়, পেশী শিথিল হয় এবং শারীরিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়। মন শুদ্ধচিত্তা করার সহায়ক হয়।

৮। পায়ের পাতা, হাঁটু ও গোড়ালির নমনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় গাঁটের বাতজনিত ব্যথা দূর হয়, দীর্ঘক্ষণ হাঁটার-চলার ক্ষেত্রে পা সক্রিয় থাকে।

## পশ্চিমোত্তাসন

শরীরের ভজ্জিমা পেছনের দিকে অর্থাৎ নিচের দিকে নুইয়ে করতে হয় বলে, এই আসনটি পশ্চিমোত্তাসন নামে পরিচিত। একে অনেকে উগ্রাসনও বলে। উগ্র শব্দের অর্থ হচ্ছে শিব। শিব সংহার কর্তা বলে শিবের বৈশিষ্ট্যময় এই আসনটি সাথে সাথে সোজাসুজি করা বেশ কঠিন, তবে ধীরে ধীরে তা রপ্ত হলে খুব অনায়াসে করা যায়।

## পদ্ধতি

১। প্রথমে দুটি পা সামনের দিকে সোজা করে বসতে হবে।

২। দুই পা সোজা হলে দু'হাতের আঙুলের সাহায্যে দু'পায়ের দুটি বুড়ো আঙুল ধরতে হবে।

৩। পায়ের আঙুল ধরার সময়, কোমর থেকে দেহের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে নিতে হবে।

৪। শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে হবে।

৫। এরপর আস্তে আস্তে দেহকে সামনের দিকে নুইয়ে আনতে হবে, যাতে মাথা দু'হাঁটুর মাঝখানে স্পর্শ করে।

৬। প্রথম অবস্থায় পুরোপুরি স্পর্শ না হলে অভ্যাসের মাধ্যমে ধাপে ধাপে তা আয়ত্তে আনা যায়।

৭। পেটকে আসনরত অবস্থায় ভেতর দিকে সঙ্কুচিত করতে হবে, ফলে খুব সহজেই সামনের দিকে নুইয়ে পড়তে কষ্ট হবে না।

৮। মাথা হাঁটু স্পর্শ করলে, মাথা দুটি হাতের মাঝখানে থাকবে।

৯। যাদের মেরুদণ্ড স্থিতিস্থাপক তাঁদের পক্ষে প্রথম প্রচেষ্টায় মাথা হাঁটু স্পর্শ করতে পারবে, কিন্তু স্থূলকায় বা মোটা মানুষের পক্ষে প্রথম থেকেই কিছুটা কঠিনতর হবে। তবে ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে

কয়েকদিনের মধ্যেই মাথা হাঁটু পর্যন্ত স্পর্শ করানো সম্ভব।

১০। এই আসনে বেশি সমস্যা হয় তাঁদের নিয়ে যাঁদের মেরুদণ্ড প্রথম অবস্থা থেকেই খুব দৃঢ় বা শক্ত হয়ে আছে, তাঁদের পক্ষে এক মাস নিয়মিত অভ্যাসের পর মাথা হাঁটু স্পর্শ করবে।

১১। প্রথম দিকে এই আসন শুধুমাত্র ৫ সেকেন্ড করাই উত্তম। তারপর আবার সোজা হয়ে বসতে হবে। এভাবে বারবার অভ্যাস করতে হবে।

১২। প্রথমদিকে প্রতিদিন চার বার এবং ৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত অভ্যাস করাই বিধেয়। এই আসন ভালভাবে রপ্ত হলে ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে দিতে হবে।

### উপকারিতা-

১। দেহের গ্রন্থিগুলি নমনীয়, সবল ও সতেজ হয়। কোমরের ব্যথাবেদনা উপশম হয়।

২। মূত্রাশয়, উদর, পিত্তাশয় প্রভৃতি বেশ সক্রিয় ও সবল হয়ে ওঠে।

৩। দেহ শক্তিশালী, সুডৌল ও লাভণ্যময় হয়ে ওঠে।

৪। অস্ত্রের সজ্জোচন ও প্রসারণের গতি বাড়ে। ফলে খাদ্যবস্তু দ্রুত শরীরের একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর ঘটে।

৫। পেটে অনাকাঙ্ক্ষিত চর্বি কমে আসে।

৬। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ঠিক থাকে ও পরিপাকক্রিয়া সঠিকভাবে চলে।

৭। মন ও চিন্তা -চেতনা উর্ধ্বমুখী হয়।

৮। হিচকী তথা উর্ধ্বশ্বাসজনিত কোন রোগ থাকলে তা সহজেই নিরাময় হয়।

৯। যাঁদের বেশিক্ষণ পায়ে হাঁটতে কষ্ট হয়, এ আসনের ফলে পায়ের পেশী ও স্নায়ুগুলিকে খুব সবল ও সতেজ হয়ে ওঠে। দীর্ঘক্ষণ হাঁটলেও ক্লান্তি আসে না। পায়ের বাত নিরাময় হয়।

১০। এ আসনে খুব সহজেই শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি আসে। মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে এ আসন নিয়মিত অভ্যাসে ভালো সুফল দেয়।

১১। মেরুদণ্ড, পেট, হৃদপিণ্ডের যথাযথ ব্যায়াম হয়। ফলে পেটে বাড়তি মেদ জমতে পারে না। মেরুদণ্ড সংকোচন-প্রসারণে নমনীয় হয় ও হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়।

১২। পেটে অসুখ হলে তা দ্রুত সারিয়ে তুলতে এ আসন অতি উত্তম।

১৩। বহুমূত্র রোগ নিরাময় করে।

১৪। মনোবল বৃদ্ধি করে ও শরীরের স্নায়ুবিদ্যুৎ দুর্বলতা কমে যায়।

## ভুজঙ্গাসন

ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। এই আসনের দেহভঙ্গিমা সাপের মতো দেখায় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে ভুজঙ্গাসন (ভুজঙ্গ + আসন)।

পদ্ধতি—

১. সমতল স্থানে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। পায়ের দুই পাতা ও গোড়ালি জোড়া থাকবে।
২. দুই হাত কনুই থেকে ভাঁজ করে বুকের দুই পাশে স্থাপন করতে হবে।
৩. হাতের তালু মাটির দিকে ফেরানো থাকবে।
৪. দুই হাতে ভর দিয়ে মাথাসহ শরীরের উর্ধ্বাংশ ধীরে ধীরে উপরে তুলতে হবে।
৫. এবার হাত ও পেটের উপর ভর দিয়ে শরীরকে উর্ধ্বমুখী করে ত্রিশ সেকেন্ড অবস্থান করতে হবে। এই সময় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।
৬. ত্রিশ সেকেন্ড পর আসন ত্যাগ করে, শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

## উপকারিতা—

১. মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। মেরুদণ্ডের বাত দূর হয়।
২. কোমরের বাত ও ব্যথার উপশম হয়।
৩. পিঠ ও কোমরের পেশি মজবুত হয়।
৪. মেয়েদের ঋতুস্রাবের ব্যাথা ও অনিয়ম দূর হয়।
৫. যকৃত, প্লীহার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৬. অর্জীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্যের উপশম হয়।
৭. উচ্চ-রক্তচাপের রোগীদের জন্য এই আসন অত্যন্ত সুফল প্রদান করে থাকে।

- শিক্ষার্থীদের ‘যোগ-অমৃত’ তালিকায় দেওয়া যোগাসনগুলোর পদ্ধতি এবং উপকারিতা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখতে বলুন।
- যোগাসনের মাধ্যমে আমরা যা-কিছু অর্জন করতে পারি শিক্ষার্থীদের তা ‘ধ্যানমান আত্ম-উপলব্ধি’ ছকটির উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করতে বলুন।

ধর্ম-বর্ণ-জাতি-অঞ্চল নির্বিশেষে সারা বিশ্বেই মানুষ এখন শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য যোগ ব্যায়াম বা ইয়োগা করছে। তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ইয়োগ সেন্টার, ইয়োগা ক্লাব ইত্যাদি। ইয়োগা ক্যাম্পেরও আয়োজন হয়। এমনকি ২১ জুনকে ঘোষণা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক ইয়োগা ডে হিসেবে।

তোমরাও একটি ‘ইয়োগা ক্লাব’ গঠনের উদ্যোগ নাও। আর সুবিধাজনক একটি দিনে বিদ্যালয়ে ‘ইয়োগা ডে’

পালন করো। সেদিন ইয়োগা ক্যাম্পেরও আয়োজন করবে। সুস্থতা, স্থিরতা ও মনঃসংযোগের মাধ্যমে “নিজের মাঝে এক সুন্দর পৃথিবী গড়ি/ সৃষ্টিজগতের কল্যাণ করি” এই শ্লোগান নিয়ে কাজ করে যাও।

## ধাপ-৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দল/ জোড়াকে এক/ একাধিক যোগাসন করে দেখাতে বলুন।
- প্রতিটি দল/ জোড়াকে যোগাসন সম্পর্কে এক মিনিট বক্তব্য দিতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের ‘একটি ইয়োগা/ যোগাসন ক্লাব’ গঠন করতে বলুন।
- সকল শিক্ষার্থীর মতামতের ভিত্তিতে ‘ইয়োগা ক্লাব গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর তালিকা’ করতে দিন।
- স্কুলে একদিন ইয়োগা ক্যাম্প করে ইয়োগা ডে পালন করার ব্যবস্থা করে দিন।
- ইয়োগা ডে’তে কী কী করা যায় সকলের আলোচনার ভিত্তিতে ‘ইয়োগা ডে কর্মসূচি’ ছকে তার পরিকল্পনা লিখতে বলুন। তারপর দলগত আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে বলুন।
- মাঝে মাঝে ক্লাবের কার্যক্রমের খোঁজ নিন। পরামর্শ দিন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।
- ‘ধ্যানমান আত্ম-উপলব্ধি’ কাজটি সম্পর্কে শিশুদের বলুন, তারা যেন যোগ, ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে তালিকায় থাকা অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাগুলো অর্জনের চেষ্টা করে। এই আত্মমূল্যায়নের কাজটি তারা বছর শেষে করবে।



# দ্বিতীয় অধ্যায়

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### যোগ্যতা ৮.২

হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।

### শিখন অভিজ্ঞতা ৪: ধর্মচার ও পূজা অর্চনা

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে—

- দেব-দেবী, ধর্মচার ও পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা
- মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণ কামনা করা
- হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা

### বিষয়বস্তু

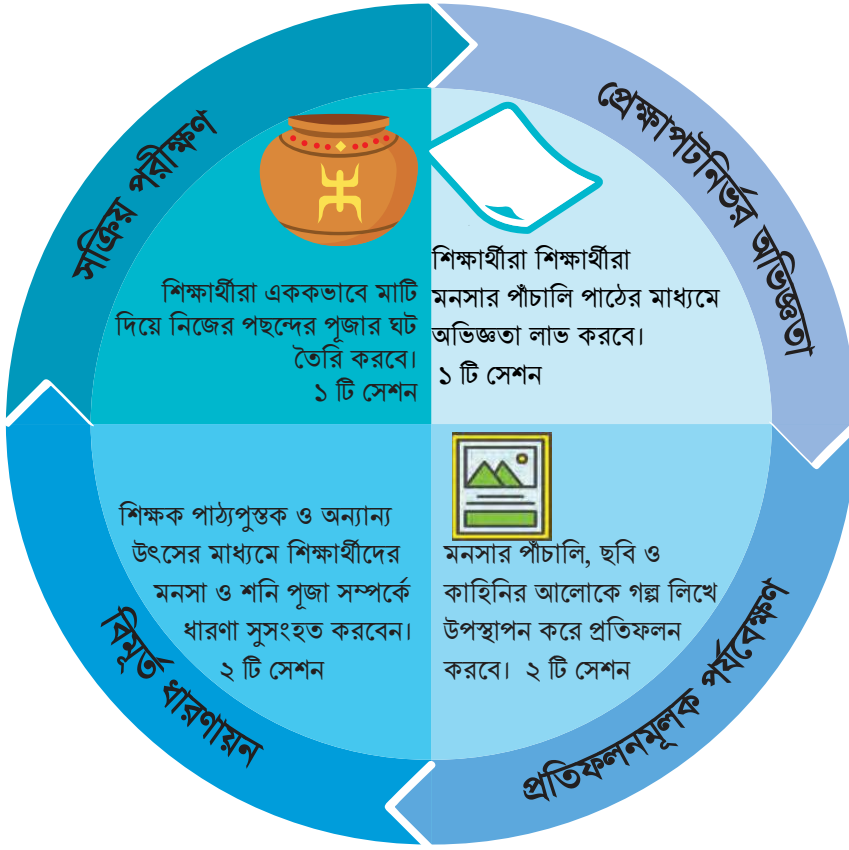
মনসা ও শনি পূজা

### অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা দল/জোড়া গঠন করে পাঠ্যপুস্তকের সহযোগিতা নিয়ে মনসার পাঁচালি পাঠ করবে। দল/জোড়ায় মনসা পূজার কাহিনি আলোচনা করে পাঠ্যপুস্তকের ছকে এককভাবে পয়েন্ট আকারে লিখে এবং সকলের সামনে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনসা ও শনিদেবের পূজা সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা মাটি দিয়ে পূজার ঘট তৈরি করবে। বাড়িতে নিয়ে রোদে শুকিয়ে, রং করে শ্রেণিকক্ষে এনে প্রদর্শন করবে।

### বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৬ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।



## ধাপ-১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়া গঠন করে মনসার পাঁচালি পাঠ করতে বলুন।

## ধাপ-২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের মনসার পাঁচালিতে কোন দেবী সম্পর্কে বলা হয়েছে আর তাঁর সম্পর্কে কী কী বলা হয়েছে তা দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে ‘দেবী-কথন’ হকে পয়েন্ট আকারে লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে থাকা মনসা পূজার প্রচলনের কাহিনির ছবিগুলো দেখতে বলুন। তবে ছবিগুলো কীসের আপনি তা বলে দেবেন না; শিক্ষার্থীদের ভাবতে বলুন।
- তাদের মনসা পাঁচালির সংক্ষিপ্ত কাহিনিটি পড়তে বলুন। এখানেও আপনি কীসের কাহিনি তা আগে থেকে বলবেন না।
- এবারে শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা মনসার পাঁচালি, ছবি এবং গল্পটির মধ্যে যে যোগসূত্র খুঁজে পেল তা নিয়ে এককভাবে একটি গল্প লিখতে এবং গল্পটির একটি নাম দিতে।

- লেখা শেষ হলে, শিক্ষার্থীদের জানান, তারা যে গল্পটি লিখেছে তাতে মনসা দেবীর কাহিনি ফুটে উঠেছে।
- শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে নিজের লেখা গল্প উপস্থাপন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের মনসার পাঁচালিতে কোন দেবী সম্পর্কে বলা হয়েছে আর তাঁর সম্পর্কে কী কী বলা হয়েছে তা দলে/জোড়ায় আলোচনা করে ‘দেবী-কথন’ হুকে পয়েন্ট আকারে লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে থাকা মনসা পূজার প্রচলনের কাহিনির ছবিগুলো দেখতে বলুন। তবে ছবিগুলো কীসের আপনি তা বলে দেবেন না; শিক্ষার্থীদের ভাবতে বলুন।
- তাদের মনসা পাঁচালির সংক্ষিপ্ত কাহিনিটি পড়তে বলুন। এখানেও আপনি কীসের কাহিনি তা আগে থেকে বলবেন না।
- এবারে শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা মনসার পাঁচালি, ছবি এবং গল্পটির মধ্যে যে যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে তা নিয়ে দলে/জোড়ায় আলোচনা করে এককভাবে একটি গল্প লিখতে এবং গল্পটির একটি নাম দিতে।
- লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীদের জানান, তোমরা যে গল্পটি লিখেছে তাতে মনসা দেবীর কাহিনি ফুটে উঠেছে।
- শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে নিজের লেখা গল্প উপস্থাপন করতে বলুন।

## ধাপ-৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ২টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা যে মনসার পাঁচালি পড়ে ছবি ঐঁকেছ, মনসা পূজার কাহিনি লিখেছ, এই কাহিনি নিয়ে এরকম অনেক আখ্যান লেখা হয়েছে, অনেক গান, নাটক, সিনেমা, পাত্রাপালা, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। আমাদের দেশে এই পূজা খুব জনপ্রিয়। সনাতন ধর্মাবলম্বী ছাড়াও অনেক লোক এই লোকজ দেবী মনসাকে ভক্তি করে। এরকম আর একজন জনপ্রিয় দেবতা হলেন শনিদেব। চলো, আমরা এই দুজনের পরিচয় এবং পূজা সম্পর্কে এবার জানি।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে মনসা এবং শনিদেবের পূজা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন।

## সহায়ক তথ্য

### ধর্মচার ও পূজা-অর্চনা

বাংলার সাহিত্য-নাটক-সিনেমা-গানে আমরা বেহলা-লখিন্দরের কথা অনেক শুনেছি। প্রায় সাতশ বছর আগে এই কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছিল মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য। এই কাহিনিতে আমরা দেখি, দেবী মনসা পৃথিবীতে নিজের পূজা প্রচলনের জন্য চাঁদ সওদাগরকে কত ভাবেই না অনুরোধ করেছেন। চাঁদ সওদাগরের সব নৌকা ডুবিয়ে তাকে নিঃশ্ব করেছেন। একে একে ছয় ছেলেকে মেরে ফেলেছেন। তবুও চাঁদ সওদাগরের কাছ থেকে পূজা আদায় করতে পারেননি মনসা দেবী। এরপর চাঁদ সওদাগরের ছোট ছেলে লখিন্দরও বিয়ের রাতে মনসার পাঠানো সাপের কামড়ে মারা যায়। কিন্তু স্ত্রী বেহলা বহু বিদ্র-বিপত্তি অতিক্রম করে স্বর্গে গিয়ে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। এই কাহিনিই মনসার পাঁচালিতে বর্ণনা করা হয়েছে। মনসা পূজায় এই পাঁচালি পাঠ করা হয়।

চলো, মনসার পাঁচালির কিছু অংশ পড়ে মনসা দেবীর কাহিনি জেনে নিই।

১	২	৩
<p>শিবকন্যা মনসা দেবী লভিলা জনম। দিনে দিনে বাড়ে কন্যা শশীকলা সম ॥ একদা মনসা দেবী বাসুকীকে কয়। কাহার নন্দিনী আমি দেও পরিচয় ॥</p> <p>তখন ধ্যানেতে সব জানি পঞ্চানন। সাজিতে কন্যারে লয়ে করিল গমন ॥</p> <p>কৈলাসে লইয়া গেল দেব শূল পাণি। তথায় দেখিয়া তারে হরের গৃহিণী ॥ পতির যুবতী ভার্যা করিয়া চিন্তন। বাম চক্ষু নষ্ট তার করিল তখন ॥</p> <p>পিতা শিব মনসারে লইয়া তখন। সিজুয়া পর্বতে তিনি করেন গমন ॥ বিশ্বকর্মা দ্বারা সেথা গড়ি দিব্য ঘর। মনসা দেবীরে তথা স্থাপিলেন হর ॥</p> <p>অনেক চিন্তিয়া তবে দেব শূলপাণি। কপালের ঘর্ম মুছে হস্তেতে তখনি ॥ এক কন্যা তাতে করে জনম ধারণ। মনসার সখী রূপে রহে সর্বক্ষণ ॥</p> <p>অতঃপর মনসা দেবী ভাবিলেন সার। চম্পক নগরে হবে পূজার প্রচার ॥ জগাই জেলে আর নিছনীর ঘরে ॥ ফিরিল কপাল তাদের মনসার বরে ।</p> <p>সেই গ্রামে বাস করে চাঁদ সদাগর। সনকার স্বামী সদা পূজেন শঙ্কর ॥ মনসার প্রভাব যখন সনকা শুনিল। মনসা পূজিতে মনে ভক্তি উপজিল ॥</p>	<p>দেবীরে সনকা ডাকে পরম সাদরে। মনসার পূজা করে নানা উপচারে ॥ এ খবর পেয়ে চাঁদ হয়ে রোষায়িত। হেতালের গদা হাতে তথা উপনীত ॥</p> <p>চাঁদের আচার হেরি রুষ্ট হয়ে বিষহরি সর্পগণে আদেশ করিল ॥ পাইয়া আদেশ তার ক্রমে ছয় পুত্র তার। দংশনেতে যম ঘর দিল ॥</p> <p>তখন সনকা সতী পঞ্চমাস গর্ভবতী। বাণিজ্যেতে গেল পতি দুঃখে দিন কাটায় অতি</p> <p>দশমাস দশদিনে শুভলগ্ন শুভক্ষণে। পাড়া পড়শি সংবাদ পেয়ে সত্তর আসিল ধৈয়ে। পুত্র দেখি সবে হয় খুশি ॥ রূপে অতি মনোহর সর্বচিত্ত মুগ্ধকর। ভূতলে আসিল যেন শশী ॥ হোথা চাঁদ সদাগরে মনসার কৌপে পড়ে। জলে ডুবে তার সপ্ততরী ॥ তীরে উঠে অতি কষ্ট করি ॥ অতিশয় দীন বেশে বেড়াইয়া দেশে দেশে। কোনক্রমে আসি নিজ ঘর ॥ তনয়ের মুখ দেখি হইল পরম সুখী। নাম তার রাখে লখিন্দর ॥ দিনে দিনে শশীসম বাড়ে পুত্র নিরুপম। অধিকারী হল সর্বগুণ ॥</p>	<p>পুত্রের সুযোগ্য পাত্রী চাঁদ করি মনে। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে বেহলার সনে ॥ শুভক্ষণে শুভলগ্নে পুত্রের বিবাহ। মহাসমারোহে চাঁদ করিল সম্পন্ন ॥</p> <p>বাসরে পুত্রের মৃত্যু সর্পের দংশনে। সে কথা চাঁদের মনে জাগে সর্বক্ষণে ॥</p> <p>চাঁদের অজ্ঞাতে ছিল ছিদ্র লৌহ ঘরে। ছিদ্র আসি কালীনাগ দংশে লখিন্দরে ॥</p> <p>শ্বশুর চরণে পড়ি বেহলা তখন ॥ কাঁদিয়া বলিল মোর শুন নিবেদন। ভেলায় পতিরে লয়ে করিব গমন ॥ সুরলোকে যেয়ে আমি শিবের প্রাসাদে। অবশ্য জিয়াব মোর পতি নির্বিবাদে ॥</p> <p>আর যদি কোনক্রমে না কর স্বীকার। অনশনে ত্যাজিব এ জীবন আমার ॥ আজ্ঞা দিল চাঁদবেনে না দেখে উপায়। বধূসহ লখিন্দরে মান্দাসে ভাসায় ॥ গুরুজন পদ বন্দি বেহলা সুন্দরী।</p> <p>দেবীর প্রসাদে চলি যায় সুরপুরী ॥ দেবের সভায় নৃত্য করিয়া বেহলা। সর্বদেবগণে তথা সন্তুষ্ট করিলা ॥</p> <p>বেহলা প্রতিজ্ঞা করে দেবের সভায়। মনসার পূজা করাইবে শ্বশুর দ্বারায় ॥ তুষ্ট হয়ে জিয়াইল দেবী লখিন্দরে। আরও এনে দিল মৃত ছয়টি ভাসুরে ॥</p> <p>বেহলা শ্বশুর পদে করিল মিনতি। তুষ্ট হয়ে চাঁদে করে মনসার স্তুতি ॥</p>

**ধর্মাচার:** ধর্মাচার হলো ধর্মীয় রীতিনীতির অন্তর্গত কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্ম। আবার ধর্মানুষ্ঠানের সময় যেসব রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাও ধর্মাচার। ধর্মাচারকে অনেক সময় লোকাচারও বলা হয়। মানুষের বিশ্বাস অনুসারে অঞ্চলভেদে রীতিনীতির পার্থক্যের কারণে ধর্মাচার লোকাচারে পরিণত হয়। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুসারে, সংক্রান্তি উৎসব, গৃহপ্রবেশ, জামাইষষ্ঠী, রাখিবন্ধন, হাতেখড়ি প্রভৃতি হচ্ছে ধর্মাচার।

**দেবদেবী:** হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয় দু'ভাবে। নিরাকার ও সাকার রূপে। পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান। প্রকৃতির গাছপালা জীবজন্তু আকাশ-বাতাস সবকিছুর মধ্যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে পরমেশ্বরের রূপ কোনো আকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই তিনি নিরাকার। নিরাকার হলেও ভক্তের আহ্বানে পরমেশ্বর সাকার রূপে ভক্তের কাছে আবির্ভূত হন। তখন তিনি সুনির্দিষ্ট রূপ, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার অধিকারী হন। বিশেষ উদ্দেশ্য, বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ কাজের জন্য আবির্ভূত পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের সেই সাকার রূপকে বলা হয় দেবদেবী। যেমন: ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা, শনি প্রমুখ।

**পূজা-অর্চনা:** ধর্মীয় রীতিনীতিকে অনুসরণ করে যেসব অনুষ্ঠানাদি করা তাই ধর্মানুষ্ঠান। পূজা হলো ধর্মানুষ্ঠান। পূজা শব্দের অর্থ সম্মান জানানো। ভক্তি নিবেদন করা। হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় বিধিবিধান মেনে দেবদেবীর পূজা করা হয়। কোনো সম্মানিত অতিথি ঘরে এলে আমরা তাঁকে সম্মান জানাই। অতিথির স্নান-আহার-বিশ্রাম সবকিছুর প্রতি খেয়াল রাখি। বিদায় সম্ভাষণ জানাই। দেবদেবীর পূজাও তেমনি। আসনশুদ্ধি, সংকল্প, বিঘ্ন অপসারণ, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞ, আরতি, অঞ্জলি, বিসর্জন প্রভৃতি পূজার অঙ্গ। আবার গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পাদ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদি বাহ্য-উপচারে দেবদেবীর পূজা করা হয়। মনের ভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ব্যাকুলতা, একাগ্রতা ইত্যাদি অন্তঃ-উপচারের সাথে পূজা করলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়। পূজা-বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যপহৃতমশ্লামি প্রযতান্নঃ।।

(গীতা, ৯/২৬)

**সরলার্থ:** যে ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল ভক্তিসহকারে আমাকে উৎসর্গ করে, শুদ্ধচিত্ত সেই ভক্তের ভক্তিপূর্ণ উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ করি।

নিচে মনসাপূজা ও শনিপূজার বিবরণ দেওয়া হলো:

## মনসা দেবীর পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

### মনসা দেবীর পরিচয়

মনসা সাপের দেবী। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে মনসাপূজা হয়। মনসাপূজার সঙ্গে মানুষের জীবন জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে। একসময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক স্থানের মানুষেরা জলাশয়ের ধারে, নদীর পাড়ে, জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করত। এসব স্থানে প্রচুর সাপের বাস ছিল। এ কারণে মানুষ সাপের দংশন থেকে রক্ষা পেতে মনসা দেবীর পূজা করত।

মনসা মূলত লৌকিক দেবী। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অনেকে তাঁর পূজা করে। মানুষের মাধ্যমে লৌকিক সমাজে মনসাপূজার প্রসার ঘটেছে। পরবর্তীকালে সৃষ্ট কিছু পুরাণে মনসা দেবীর উদ্ভব ও প্রসারের কথা বলা হয়েছে। এভাবে লৌকিক থেকে তিনি পৌরাণিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন।

মনসা দেবীকে বিষহরী, মহাজ্ঞানযুক্তা ও সিদ্ধিদাত্রী বলা হয়। সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান থেকে উচ্চতর জ্ঞান হলো মহাজ্ঞান। মহাজ্ঞান জাগরিত হলে মনের হিংসা, নিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি নষ্ট হয়। হিংসা-নিন্দা মনকে বিষময় করে। সাপের বিষের যন্ত্রণা থেকেও যা তীব্রতর। মহাজ্ঞান সেই বিষকে বিনষ্ট করে। মনসা পূজার মাধ্যমে মানুষের মনে মহাজ্ঞান জাগরিত হয়। মানুষের মনের বিদ্রোহ-বিষ নষ্ট হয়। মন আনন্দে ভরে ওঠে। সেকারণে তিনি বিষহরী। আবার মহাজ্ঞানী ধাপে ধাপে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হন। দেবী মনসাকে পূজার মাধ্যমে সেই সিদ্ধি লাভ হয়, তাই তিনি সিদ্ধিদাত্রী।

### মনসা দেবীর প্রতিমা

মনসা দেবীর চার হাত। একটি বাম হাতে সাপ। একটি ডান হাতে অভয়মুদ্রা। প্রতিটি হাতে রয়েছে অতি বিষধর সাপের কঙ্কণ। দেবীর মাথায় সাতটি সাপের একটি মুকুট। প্রতিটি সাপের মাথায় রয়েছে মণি। সাদা চাঁপা ফুলের মতো তাঁর গায়ের রং। তাঁর পরনে উদীয়মান সূর্যের মতো লাল রঙের কাপড়। মনসাকে ঘিরে আছে আটটি সাপ— অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ। তাঁর বাহন হাঁস। চন্দ্রবদনা দেবী হাঁসের উপর বসে থাকেন। তাঁর পায়ের নিচে রয়েছে পদ্মের আসন।

### মনসা দেবীর পূজাপদ্ধতি

মনসা পূজা করা হয় দু'ভাবে— ঘট অথবা প্রতিমা স্থাপন করে। এই পূজার জন্য বিশেষ ঘট তৈরি করা হয়। ঘটে সর্পমূর্তি থাকে। বিধি মেনে সেখানে মনসার পূজা করা হয়। একারণে অঞ্চলভেদে মনসা পূজার অপর নাম ঘটপূজা। পূজার আঞ্জিনায় সিঁজ গাছ লাগানো হয়। সিঁজ গাছ হলো মনসা পূজায় জন্য বিশেষ গাছ, যা ফণীম-নসা গাছ নামেও পরিচিত। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর পূজা হয়। এই তিথিকে বলা হয় নাগপঞ্চমী। আবার শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতেও এই পূজার বিধান রয়েছে। পূজা-শেষে মনসা দেবীর পাঁচালি পাঠ করা হয়।

পারিবারিক আঞ্জিনা, একক মন্দির বা সর্বজনীন মন্দিরে মনসা পূজা করার নিয়ম প্রচলিত।

### মনসা দেবীর প্রণামমন্ত্র

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।

জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমোহস্তু তে॥

**সরলার্থ:** আস্তিক মুনির মাতা, বাসুকি নাগের ভগিনী, জরৎকারু মুনির পত্নী হে মনসা দেবি, তোমাকে নমস্কার।

### মনসা পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

মনসাকে সাপের দেবী হিসেবে পূজা করা হয়। এতে মানুষের মনে সাপের ভীতি দূর হয়। জল-জঞ্জালপূর্ণ ভূখণ্ডে জীবন-জীবিকার জন্য রাতবিরাতে মানুষকে নানা কাজে বের হতে হয়। সেসময়ে মনসার পূজারীর মনে সাপের ভীতির পরিবর্তে একধরনের আস্থা বিরাজ করে। ফলে সাপ দেখে ভক্ত ভয় পায় না। সাহস ধরে রাখে।

সাপ একটি প্রাকৃতিক প্রাণী। তার ওপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করলে প্রকৃতির প্রতি মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশ পায়। মানুষ সাপকে হত্যা না করে তাকে রক্ষা করে। সাপ রক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পায়। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সাপের ভীতি দূর করা, সাপকে বাঁচানো, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার পাশাপাশি প্রকৃত জ্ঞান লাভ ও মনের হিংসা-বিদ্বেষ ধ্বংস করাই মনসাপূজার উদ্দেশ্য।

- শিক্ষার্থীদের মনসা পূজার প্রধান কয়েকটি উদ্দেশ্য ‘মনসা-স্তুতি রহস্য’ হকে লিখতে বলুন।

## শনিদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

### শনিদেবের পরিচয়

হিন্দুধর্মে একজন দেবতা শনি। নবগ্রহের মধ্যে অন্যতম গ্রহ শনির নাম অনুসারে তাঁর নামকরণ। ব্যক্তিগত জীবনের নানা বাধাবিপত্তি দূর করা এবং পৃথিবীর কল্যাণের জন্য শনিপূজা করা হয়।

সূর্য ও বিশ্বকর্মার কন্যা ছায়ার পুত্র শনি। তিনি পৌরাণিক দেবতা। তাঁর চার হাত। হাতে ধীর-ধনুক ও দণ্ড। অসদাচারীকে শাস্তিপ্রদানের প্রতীক এই দণ্ড। তাঁর গায়ের রং কালো। পরিধেয় বস্ত্রও কালো। কালো রঙের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে অঞ্জনের (কাজলের) মতো দেখায়। এ কারণে তাঁকে ‘নীল-অঞ্জন-চয়-প্রখ্য’ বলা হয়। তাঁর গতি অত্যন্ত ধীর, শনিগ্রহের মতো। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘুরে আসতে সময় লাগে এক বছর। সেখানে শনিগ্রহের সময় পৃথিবীর ঊনত্রিশ গুণ। অর্থাৎ ঊনত্রিশ বছর। ধীরগতির জন্য তাই শনিদেবকে ‘শনৈশ্চর’ বলা হয়। ‘শনৈঃ’ শব্দের অর্থ ধীরে ধীরে।

### শনিদেবের পূজাপদ্ধতি

প্রতি শনিবার গৃহের আঙ্গিনায় শনিদেবের পূজার বিধান রয়েছে। সর্বজনীন শনিমন্দিরেও শনিপূজা করা যায়। পূজার জন্য লৌহ-আসন, লৌহ-পাত্র, লৌহ-ঘট দরকার হয়। বিকল্পে কালো কাপড়ে মোড়া আসন, কালো রঙের পাত্র এবং কালো রঙের ঘট ব্যবহার করার বিধান রয়েছে। এছাড়া কালো তিল, কালো বা নীল রঙের ফুল, কালো শাড়ি বা কালো পাড়যুক্ত শাড়ি মুখ্য উপচার। এছাড়া, ঋতুভিত্তিক পাঁচ প্রকারের ফল, পাঁচ প্রকারের শস্য, ধূপ-দীপ, পান-সুপারি, আটা, গুড়, বাতাসা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। পূজা শেষে শনিদেবতার পাঁচালি পাঠ করা হয়। পাঁচালি পাঠ শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

- শিক্ষার্থীদের শনিদেবের পূজার উপাচার-সংশ্লিষ্ট নিচের ‘চেনা উপাচার’ ছকটি পূরণ করতে বলুন।

### শনিদেবের প্রণামমন্ত্র

নীলাঞ্জন-চয়-প্রখ্যং রবিসূত-মহাগ্রহম্।

ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং ত্বং নমামি শনৈশ্চরম্॥

**সরলার্থ:** নীল অঞ্জনের ন্যায় রং, ছায়ার গর্ভজাত সূর্যদেবের পুত্র শনিদেবতাকে নমস্কার।



## শনিদেবের পঁচালি

শনিদেবের পঁচালি পাঠ করার আগে গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রমুখ দেবতাদের স্মরণ করতে হয়। এরপর শনিদেবতাকে স্মরণ করে পঁচালি পাঠ শুরু করতে হয়।

### ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

শ্রীহরি নামেতে এক ছিল দ্বিজবর।  
করিতে ব্রাহ্মণ সেবা ছিল মন তাঁর ॥  
নিত্য ভিক্ষা করি করে উদর পূরণ।  
তাহাতে দ্বিজ সেবা হয় অনুক্ষণ ॥  
বিনা চিন্তামণি চিন্তা অন্য চিন্তা নাই।  
কেমনে সে চিন্তামণি চিনিবারে পাই ॥  
(সংক্ষিপ্ত)

## শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ না হলে মনে এক ধরনের অতৃপ্তি ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় অনেক সময় মানুষ বিপথগামী হয়। অন্যায় কাজে যুক্ত হয়। শনিদেবতা সেই অন্যায়কারীকে শাস্তি দেন। শনিদেবতার শাস্তির ভয়ে মানুষ পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকে। এভাবে ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজ সুন্দর হয়।

পৃথিবীর ওপর সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর প্রভাব রয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে, বর্গে গন্ধে স্বাদে পরিপূর্ণ হয়। শনিগ্রহের প্রভাবও তার ব্যতিক্রম নয়। শনিগ্রহের কুপ্রভাবে পৃথিবীতে এক ধরনের বিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আবার সুপ্রভাবে পৃথিবী ফল-ফসলে পরিপূর্ণ হয়। প্রাকৃতিক গ্রহের দেবমূর্তিই শনিদেবতা। শনিদেবতার শুভ প্রভাবে ব্যক্তিগত এবং সার্বিক অমঙ্গল হয়। এ কারণে ব্যক্তি ও সমাজের পাশাপাশি সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল সাধনের জন্য আমাদের শনিদেবতার পূজা করা উচিত।

- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পূজার (উপাচার হিসেবে) ঘট এবং সেই পূজার কল্যাণকর দিক সম্পর্কে নিচের ‘কল্যাণ-ঘট’ ছকটি পূরণ করতে বলুন।

## ধাপ-৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ১ টি

- এই সেশনের প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে আগে থেকেই কাদামাটির ব্যবস্থা করে রাখুন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন, মনসা, শনি পূজাসহ সকল পূজায় আবশ্যকীয় উপকরণ ঘট। তাদের প্রত্যেককে মাটি দিন এবং একটি পূজার ঘট তৈরি করতে বলুন।
- ঘট তৈরি শেষে সেগুলিকে খোলা জায়গায় সাবধানে রাখুন। সম্ভব হলে রোদে দিন।
- ছুটির সময়ে যার যার ঘট বাড়িতে নিয়ে যেতে বলুন। রোদে শুকিয়ে, রং করে নির্দিষ্ট দিনে ক্লাসে এনে প্রদর্শন করতে বলবেন।
- তাদের তৈরি ঘটের প্রশংসা করুন। প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।
- শিক্ষার্থীদের পূজার ঘট এবং সেই পূজার কল্যাণকর দিক সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের ‘কল্যাণ-ঘট’ ছকটি পূরণ করতে বলুন।

# তৃতীয় অধ্যায়

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### যোগ্যতা ৮.২

হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।

### শিখন অভিজ্ঞতা ৫: ধর্মস্থান

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে—

- ছয়টি শক্তিপীঠ ও চতুর্থম সম্পর্কে জানা
- তীর্থভ্রমণের ফলে আত্মিক উন্নতি হয় তা অনুধাবন করা

### বিষয়বস্তু

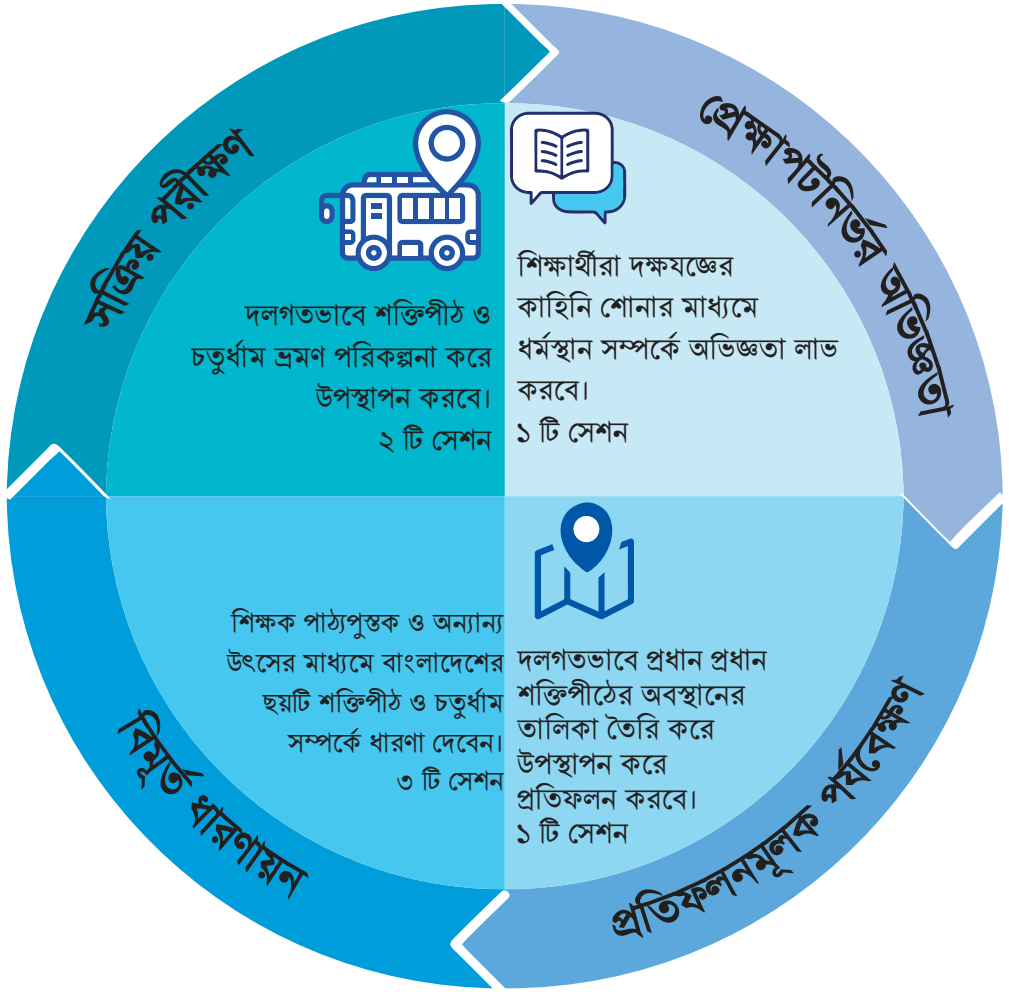
বাংলাদেশের ছয়টি শক্তিপীঠ— সুগন্ধা, ভবানী, জয়ন্তী, মহালক্ষ্মী, অপর্ণা ও যশোরেশ্বরী এবং চতুর্থম

### অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা একজন ধর্মীয় গুরু/ পুরোহিত/ ধর্ম বিষয়ে জানেন এমন ব্যক্তি/ শিক্ষকের কাছে দক্ষযজ্ঞে শিবের কাণ্ডর গল্প শুনবে। অথবা পাঠ্যবইয়ে লেখা গল্পটি পড়বে। দল/ জোড়ায় প্রধান প্রধান শক্তিপীঠের অবস্থানের তালিকা করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের ছয়টি শক্তিপীঠ ও চতুর্থম সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা দলে/ জোড়ায় বাংলাদেশের ছয়টি শক্তিপীঠ ভ্রমণের পরিকল্পনা করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

### বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৭ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।



## ধাপ-১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

### সেশন ১ টি

- একজন ধর্মীয় গুরু/ পুরোহিত/ ধর্ম বিষয়ে জানেন এমন ব্যক্তিকে শ্রেণিকক্ষে এনে দক্ষযজ্ঞে শিবের কাণ্ডের গল্প শিক্ষার্থীদের শোনাবেন। যদি সম্ভব না হয় তাহলে আপনি নিজেই গল্পটি শিক্ষার্থীদের শোনাবেন। অথবা পাঠ্যবইয়ে দেওয়া গল্পটি তাদের পড়তে দেবেন।

## ধাপ-২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়া গঠন করতে সাহায্য করুন। তাদের বলুন, যেখানে যেখানে সতীর দেহের এক একটি খণ্ড পড়েছে, সেইখানটাকে বলা হয় ‘শক্তিপীঠ’। তাদের এই গল্পটির আলোকে বইপত্র, সাক্ষাতকার, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে দল/ জোড়ায় তথ্য সংগ্রহ করে প্রধান প্রধান শক্তিপীঠ ও তাদের অবস্থান সম্পর্কিত পাঠ্যবইয়ের ‘শক্তিপীঠের অবস্থান’ তালিকাটি পূরণ করতে বলুন।
- তারপর পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি যে-কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে দল/ জোড়ায় শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন।

### ধাপ-৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

#### সেশন ৩ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা যে সতীর কাহিনি নিয়ে কাজ করেছ তার ছয়টি শক্তিপীঠ বাংলাদেশে আছে। এগুলো ধর্মস্থান। দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এখানে তীর্থ করতে আসেন। হিন্দুধর্মে আরও অনেক তীর্থক্ষেত্র আছে। তার মধ্যে চারটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই চারটিকে বলে ‘চতুর্থাম’। চলো, আমরা বাংলাদেশের ছয়টি শক্তিপীঠ আর চতুর্থাম সম্পর্কে জেনে নিই।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে ছয়টি শক্তিপীঠ আর চতুর্থাম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন।

### সহায়ক তথ্য

#### ধর্মস্থান

এসো, আমরা একটি গল্প পড়ি।

### সতীদেবীর জন্ম ও দক্ষযজ্ঞের কাহিনি

পুরাকালে দক্ষ নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ব্রহ্মার বরে তিনি প্রজাপতিদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা পান। একবার তিনি দেবী মহামায়াকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে এই বর চান যে, মহামায়া যেন তাঁর ঘরে কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের এই প্রার্থনা পূরণ করতে মহামায়া সম্মত হন। কিন্তু তিনি একটি শর্তও জুড়ে দেন— দক্ষ তাঁর প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। অতঃপর রাজা দক্ষ এবং রানি প্রসূতির ঘরে সতীর জন্ম হয়। তাঁদের ষোলটি কন্যা ছিল। তাঁদের মধ্যে সতীদেবী ছিলেন দেবী মহামায়ার মনুষ্যরূপ। পরবর্তীতে মহাদেবের সাথে সতীদেবীর বিবাহ হয়। এদিকে জামাতা শিব দক্ষ-রাজাকে মোটেই সম্মান করতেন না।

একবার দেবতারা এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। দক্ষ সেখানে এলে উপস্থিত প্রজাপতিরা দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানান। কিন্তু শিব দাঁড়ালেন না। জামাতা শিবের আচরণে দক্ষ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। ক্ষুব্ধ দক্ষ বাড়ি ফিরে বৃহস্পতি-যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেখানে দক্ষের সব কন্যা স্বামীসহ নিমন্ত্রিত ছিলেন। কেবল সতী আর শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। পিতার এই বৈষম্যমূলক আচরণে সতী রুষ্ট হয়ে একাই বিনা নিমন্ত্রণে পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। দান্তিক দক্ষ তখন সতীকে অপমান করেন। সতীর সামান্যই শিবের নিন্দা করতে থাকেন। স্বামী-নিন্দা শুনে সতী যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। জানতে পেরে মহাদেব শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। শোকে, ক্ষোভে তিনি নিজের মাথার জটা ছিন্ন করে ভূমিতে ফেলে দেন। ছিন্নজটা থেকে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। শিবের অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দেন। বীরভদ্রের অস্ত্রের আঘাতে দক্ষের মাথা কাটা পড়ে। তারপর শিব যজ্ঞস্থলে এসে সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয় নৃত্য শুরু করেন। নাচের ভাবাবেগে পৃথিবী রসাতলে যায় যায় অবস্থা! এ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে শিবের কাঁধে থাকা সতীর দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে থাকেন। সতীর দেহ একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হয়। খণ্ডগুলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পতিত হয়। যেসব জায়গায় সতীর দেহখণ্ড পড়েছে সেই জায়গাগুলোকে বলা হয়, এক একটি শক্তিপীঠ বা মহাপীঠ।

- এই গল্পটির আলোকে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের প্রধান প্রধান শক্তিপীঠ এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কিত 'শক্তিপীঠের অবস্থান' তালিকাটি পূরণ করতে বলুন।
- বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে দলে/জোড়ায় তারিকাটি উপস্থাপন করতে বলুন।

এই যে আমরা প্রধান প্রধান শক্তিপীঠগুলোর তালিকা করলাম, এসব জায়গা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে তীর্থস্থান। কারণ এখানে সতীদেবীর ছিন্ন শরীরের অংশ পড়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মস্থান, মন্দির, আশ্রম, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি কারণে একটি স্থান তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। এই তীর্থস্থানগুলোকে ধর্মস্থানও বলে। ধর্মস্থানগুলো ধর্মীয় দিক থেকে পবিত্র স্থান। ধর্মচর্চার স্থান। হিন্দুধর্মে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের ও তাঁদের ধর্মমতকে কেন্দ্র করে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ভক্তরা পুণ্য অর্জনের জন্য, ধর্মচর্চার জন্য সেখানে আসেন। হিন্দুধর্মের নানা উৎসবের পাশাপাশি মহাপুরুষের জীবনকেন্দ্রিক নানা উৎসবও সেখানে পালিত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে সেখানে গড়ে ওঠে আবাসনসহ বিভিন্ন অবকাঠামো। সবকিছু মিলে এই এসকল স্থানকে বলা হয় ধর্মস্থান।

আবার হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কাহিনির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো পবিত্রস্থান বা তীর্থক্ষেত্রে মন্দিরসহ নানা স্থাপনা গড়ে ওঠে। সেখানেও ধর্মচর্চা হয়। নানারকমের উৎসব হয়। দর্শনার্থী ও ভক্তদের সমাগম ঘটে। এসকল স্থানকেও ধর্মস্থান বলা হয়।

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নানা ধর্মস্থান আছে। বাংলাদেশেও বেশকিছু রয়েছে — পাবনার সংসঙ্গ, হরিচাঁদ

ঠাকুরের ওড়াকান্দিধাম, সিলেটের চৈতন্যদেবের আদি পিতৃভূমি, সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথধাম, রাজশাহীর ক্ষেতু-ডিধাম, নারায়ণগঞ্জে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বারদীধাম ইত্যাদি। এখানে আমরা জানবো, দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক কাহিনি-ভিত্তিক বাংলাদেশের ছয়টি শক্তিপীঠ এবং ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ চারটি ধাম, যা চতুর্ধাম নামে প্রসিদ্ধ।

### বাংলাদেশের ছয়টি শক্তিপীঠ

সতীর দেহখণ্ড পতিত হয়ে তৈরি হয়েছিল একান্নটি শক্তিপীঠ। এর মধ্যে ছয়টির অবস্থান বাংলাদেশে। এই পীঠস্থানগুলোর নাম— সুগন্ধা, ভবানী, জয়ন্তী, মহালক্ষ্মী, অপর্ণা ও যশোরেশ্বরী।

#### সুগন্ধা শক্তিপীঠ

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর গ্রামে সুগন্ধা নদীর পশ্চিম পাড়ে সুগন্ধা শক্তিপীঠের অবস্থান। সতী দেবীর নাসিকা এখানে পড়েছিল। নাসিকা যেহেতু গন্ধ নেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই এই পীঠের নাম দেওয়া হয় সুগন্ধা। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে—

সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।

ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা।।

নদীর অন্য পাড়ে আছে শিবের ভৈরব অবতার ‘ত্র্যম্বক’ এর মন্দির।

জনশ্রুতি অনুযায়ী এই মন্দির প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। এখানে পুরোনো মন্দিরের জায়গায় নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে। পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট নতুন মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়ার নিচে মূল গর্ভগৃহে দেবী সুগন্ধা রয়েছেন। স্থানীয়ভাবে দেবী এখানে ‘উগ্রতারা’ নামে পূজিতা।

এখানে দেবীর নিত্যপূজা হয়। আবার প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সুগন্ধাপীঠের সবচেয়ে বড় উৎসব শিবচতুর্দশী। তখন মহাধুমধামে শিবপূজা হয়। দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থী এখানে আসেন।

বরিশাল শহরের নখুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসযোগে ইসলামী যেতে হয়। সেখান থেকে রিক্সা-ভ্যানে সহজেই সুগন্ধা শক্তিপীঠে যাওয়া যায়।



### ভবানী শক্তিপীঠ

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর রয়েছে ভবানী শক্তিপীঠ। সীতাকুণ্ড বাজার থেকে প্রায় চার কিলোমিটার পূর্বে চন্দ্রনাথ পাহাড়। এর চূড়ায় ভবানী শক্তিপীঠের অবস্থান। স্থানীয়দের কাছে যা চন্দ্রনাথ শক্তিপীঠ নামে পরিচিত। এখানে দক্ষকন্যা সতীর ডান হাত পড়েছিল। ভবানী শক্তিপীঠের পাশে শিবের ভৈরব অবতার ‘চন্দ্রশেখর’ নামে পূজিত। অনন্দামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে—

চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্ধ অনুভব।

ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ॥

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সৌন্দর্য অতি মনোরম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু এই পাহাড়। চারিদিকে পাহাড়ি বন। পাহাড়ের পশ্চিম দিকে বিশাল সমুদ্র। বিশ্রাম নিয়ে ধাপে ধাপে পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে হয়। ভবানী শক্তিপীঠ ছাড়াও এখানে চন্দ্রনাথ শিবের মন্দির, মহাপুরুষকেন্দ্রিক নানা মন্দির, ধর্মশালা ইত্যাদি রয়েছে।

দেশবিদেশ থেকে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থী এখানে আসেন। পাপমোচন বা মনকে পবিত্র করার জন্য ভক্তদের আগমন ঘটে। এখানে দেবীর নিত্যপূজা হয়। ভবানী শক্তিপীঠের সবচেয়ে বড় উৎসব শিবচতুর্দশী। উৎসব উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। দেশি-বিদেশি প্রচুর পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীদের আগমন ঘটে।

চট্টগ্রাম শহরের অলঙ্কার মোড় বা কদমতলীর মোড় থেকে ঢাকা-চট্টগ্রামগামী বাসে সীতাকুণ্ড বাস স্টপেজে

থানান সে য়। পৌছানো য

বেয়ে পাহাড়ের শীর্ষে পৌছোলে দেবীর পীঠস্থানের দর্শন মেলে।

### জয়ন্তী শক্তিপীঠ

সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার কালাজোড় বাউরভাগ গ্রামে জয়ন্তী শক্তিপীঠের অবস্থান। এখানে সতীদেবীর বাম উরু পড়েছিল। জয়ন্তী শক্তিপীঠের পাশেই শিবের অবতার ভৈরব ক্রমদীশ্বর নামে পূজিত। অনন্দামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে—

জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিলা কেশব।

জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব।

এই পীঠে একটি চারকোণা অগভীর গর্তে একটি পাথরখণ্ড আছে। পাথরখণ্ডটির আকৃতিও চারকোণা। লোকশ্রুতি আছে, এ পাথরখণ্ডটি সতীর বাম উরুর রূপান্তরিত রূপ। ভক্তদের বিশ্বাস, দেবী ও ভৈরব ক্রমদীশ্বর একই কূপে একই সাথে বিরাজ করেন। জনৈক জমিদার এ পাথরের অলৌকিকত্ব জানতে পেরে এখানে মন্দির নির্মাণ করেন। পাশে অন্য একটি অগভীর কূপ আছে। যার জল অতি স্বচ্ছ। সেই জলেই দেবীর পূজা হয়।

পীঠস্থানকে কেন্দ্র করে এখানে নাটমন্দির, শিবমন্দির, সানবীধানো দীঘি নির্মিত হয়েছে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে এখানে মায়ের পূজা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থী তখন এখানে আসেন।

জয়ন্তীপীঠে আসতে হলে সিলেট থেকে বাসযোগে প্রথমে চতুলবাজার, চতুলবাজার থেকে অটোরিকসাযোগে শলৈঘাট হয়ে কালাজোড় বাউরভাগে যেতে হবে। এখানেই দেবীর দর্শন পাওয়া যায়।

### মহালক্ষ্মী শক্তিপীঠ

সিলেট জেলার আর একটি শক্তিপীঠের নাম মহালক্ষ্মী। সিলেট শহরের তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে দক্ষিণ সুরমায়, সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ মহাসড়কের পশ্চিম পাশে জৈনপুর গ্রামে এই পীঠের অবস্থান। এখানে সতী দেবীর গ্রীবা (গলা) পতিত হয়। তাই একে গ্রীবা-মহাপীঠও বলা হয়। দেবীর গ্রীবা পড়েছিল একটি শৈলখন্ডের উপর। সেই শৈলখন্ডই দেবীরূপে পূজিত। মহাদেব ভৈরব এখানে সর্বানন্দ নামে পূজিত। অন্নদামঞ্জাল কাব্যে বলা হয়েছে—

শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।

সর্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি।।

পুরাতন মন্দিরের পরিবর্তে এখানে নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে। যা অত্যন্ত কারুকার্য-খচিত, প্রশস্ত ও দৃষ্টিনন্দন। এখানে নবরাত্রি উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। তখন দেশ-বিদেশ থেকে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে।

সিলেটে শহরের কনুদ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে মোগলাবাজার রোড ধরে রকিসা, ভ্যান বা অটোরিক্স-সায় তিন কিলোমিটার গলেই মহালক্ষ্মী শক্তিপীঠে পৌঁছানো যায়।

### অপর্ণা শক্তিপীঠ

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে অপর্ণা শক্তিপীঠের অবস্থান। দেবীর বাম পায়ে গৌড়ালি বা বাম কান এখানে পড়েছিল। মহাদেবের অবতার ভৈরব এখানে বামন নামে পূজিত। অন্নদামঞ্জালে বলা হয়েছে—

করতোয়া তটে পড়ে বাম কর্ণ তাঁর।

বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার ।।

এই পীঠস্থানে অনেকগুলো পুকুর রয়েছে। যার মধ্যে বিখ্যাত শাঁখারী-পুকুর। নাটোরের মহারানি ভবানীকে এই পুকুরের মধ্যে শাঁখা-পরিহিতা অবস্থায় দেবী দেখা দিয়েছিলেন, এমন লোকশ্রুতি রয়েছে। ভক্তরা তাই পাপমোচনের জন্য এই পুকুরের জলে স্নান করেন। শিবমন্দির, নাটমন্দির, গোপালমন্দির, ভোজনশালা—সব মিলে পীঠস্থানটি গড়ে উঠেছে। দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, রামনবমী, মাঘীপূর্ণিমা ইত্যাদি উৎসব সাড়ম্বরে এখানে পালিত হয়। দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীরা তখন এখানে আসেন।

বগুড়া থেকে বাসযোগে শেরপুর এবং শেরপুর থেকে রকিসা বা ভ্যানে করে সহজেই অপর্ণা শক্তিপীঠে পৌঁছানো যায়।

### যশোরেশ্বরী শক্তিপীঠ

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর গ্রামে যশোরেশ্বরী শক্তিপীঠ অবস্থিত। যশোরেশ্বরী অর্থ যশোরের ঈশ্বরী। অর্থাৎ যশোরের দেবী। এখানে দেবীর হাতের তালু ও পায়ের পাতা পতিত হয়। মহাদেব শিবের অবতার ভৈরব চন্ড নামে এখানে পূজিত। এখানকার পীঠের মূল মন্দির, শিবমন্দির, পুকুর সবই ত্রিকোণাকৃতি। এই পীঠস্থানে নিত্যপূজা হয়। সবচেয়ে বড় উৎসব শ্যামাপূজা। পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। দূর-দুরান্ত থেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা উৎসবে যোগ দেন। মন্দিরের পাশে মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতির অবস্থান সেই সর্বজনীনতা প্রমাণ করে।

সাতক্ষীরার কন্দেদ্রীয় বাসটার্মিনাল থেকে বাসযোগে শ্যামনগর এসে রকিসা-ভ্যান করে যশোরেশ্বরী শক্তিপীঠে পৌঁছানো যায়।

- শিক্ষার্থীদের এই ছয়টি শক্তিপীঠের নাম ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচের ছকে দলে/জোড়ায় আলোচনা করে ‘শক্তিপীঠের বৈশিষ্ট্য’ ছকে লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের মানচিত্রে ছয়টি শক্তিপীঠের অবস্থান চিহ্নিত করে ‘মানচিত্রে শক্তিপীঠ’ কাজটি করতে বলুন।

### চতুর্ধাম

‘ধাম’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিবাস, আশ্রয়স্থল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে দেবতার অধিষ্ঠিত নিবাসস্থলই ধাম। অলৌকিক ধর্মীয় কাহিনি বা মহাপুরুষদের জীবন-লীলার সাথে যুক্ত পুণ্যভূমিকেও ধাম বলা হয়। ভক্তরা নিজের পাপমোচন, পুণ্য অর্জন, সর্বোপরি নির্মল প্রশান্তি লাভের জন্য ধামে আসেন। ধামে এসে সংসারে আবদ্ধ জীবের মনের নানা জটিলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যায়। ধামগুলোকে তাই পুণ্যভূমি, তীর্থক্ষেত্র বা মোক্ষভূমিও বলা হয়। ধামের মূল দেবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মন্দির। আবার, আগত ভক্তদের সুবিধার্থে সেখানে আবাসন, রন্ধনশালা, ভোজনালয়, ধর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থাও থাকে। এসকল প্রতিষ্ঠানকে একসাথে ধাম বলা হয়।

হিন্দুধর্মে অনেক ধামের উল্লেখ আছে। ধামগুলোর মধ্যে চারটি ধাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— বদ্রীনাথধাম, রামেশ্বরমধাম, দ্বারকাধাম এবং জগন্নাথধাম। এদেরকে একসাথে চতুর্ধাম বলা হয়। ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চার প্রান্তসীমায় চারটি ধামের অবস্থান। ভারতের মানচিত্রকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের দিক থেকে সমান দুই ভাগ করে একটি গাণিতিক যোগ-চিহ্ন (+) আঁকা হলে চিহ্নের বাহুগুলোর শীর্ষপ্রান্তে ধামগুলোর অবস্থান। বদ্রীনাথধাম ভারতের উত্তর সীমানায়, রামেশ্বরমধাম দক্ষিণ সীমানায়, দ্বারকাধাম পশ্চিম সীমানায় এবং জগন্নাথধাম পূর্ব সীমানায় অবস্থিত। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, বদ্রীনাথধাম সত্যযুগের, রামেশ্বরমধাম ত্রেতাযুগের, দ্বারকাধাম দ্বাপরযুগের এবং জগন্নাথধাম কলি যুগের কাহিনির সাথে যুক্ত। তীর্থক্ষেত্রের পাশাপাশি ধামগুলো দর্শনীয় স্থান হিসেবেও মনোরম।

## বদ্রীনাথধাম

ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের চামোলি জেলার একটি শহর বদ্রীনাথ। শহরের গাড়োয়াল পার্বত্য এলাকায় অলকানন্দা নদীর ধারে বদ্রীনাথধাম অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার মিটার উচ্চতায় এই ধামের অবস্থান। ভগবান বিষ্ণু এখানে বদ্রীনারায়ণ-রূপে পূজিত। স্থানীয়রা এই ধামকে ‘দীব্যদেশম’ বলেন। তাঁদের বিশ্বাস ভগবান বিষ্ণু এখানে জাগ্রত অবস্থায় রয়েছেন।

দীর্ঘ সিঁড়ি অতিক্রম করে মূল মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরটি তিন ভাগে বিভক্ত— সভামণ্ডপ, দর্শনমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে চাঁদোয়ার নিচে বদ্রীনায়্যণের চতুর্ভুজ মূর্তি স্থাপিত। কষ্টিপাথরের এই মূর্তির উচ্চতা এক মিটার। উপরের দুই হাত উত্তোলিত অবস্থায় শঙ্খ ও চক্র ধারণ করা। নিচের দুই হাত যোগমুদ্রায় ও পদ্মাসনে স্থিত।

মন্দিরের একদিকে নরপর্বত এবং বিপরীত দিকে নারায়ণ-পর্বত। মন্দিরে রয়েছে তপ্তকুণ্ড নামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। ভক্তদের বিশ্বাস কুণ্ডের জলে স্নান করলে রোগমুক্তি হয়। পাহাড়ি পরিবেশ, বহমান অলকানন্দা নদী— সব মিলে বদ্রীনাথধামের পরিবেশ অতি মনোরম। রাতের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে তা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

লোকশ্রুতি অনুসারে, শঙ্করাচার্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অলকানন্দা নদী থেকে বদ্রীনাথের মূর্তি উদ্ধার করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে বদ্রীনাথধামে ভক্তদের সমাগম বাড়তে থাকে। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, বদ্রীনাথধামের প্রকৃত নাম বদরিকা-ধাম বা বদরিকাশ্রম। সংস্কৃতে ‘বদর’ শব্দের অর্থ কোলিবৃক্ষ বা কুল গাছ। ভগবান বিষ্ণু হিমালয়ের এই তীব্র শীতাত্তলে ধ্যানমগ্ন হন। তাঁকে শীত থেকে রক্ষার জন্য লক্ষ্মীদেবী বদরবৃক্ষ-রূপে ছায়া দিতে থাকেন। সহধর্মিণীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান নারায়ণ এই স্থানের নাম দেন বদরিকা-শ্রম। পরে তা বদ্রীনাথধামে পরিচিত হয়।

এখানে ‘গঞ্জামাতার আবির্ভাব’ উৎসব সাড়শ্বরে পালিত হয়। হিমালয় থেকে দেবী গঞ্জার পৃথিবীতে আবির্ভাবকে উপলক্ষ করে এই উৎসব। ভারতের কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে রেলযোগে উত্তরাখণ্ডের হৃষিকেশে যাওয়া যায়। সেখান থেকে গণ-পরিবহনে বদ্রীনাথধামে পৌঁছে বদ্রীনায়্যণের বিগ্রহ দর্শন করা যায়। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী বিগ্রহ দর্শনে আসেন। উল্লেখ্য, বদ্রীনাথধাম বছরে ছয় মাস (এপ্রিলের শেষ থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত) দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। তীব্র শীতের বিরূপ আবহাওয়ার জন্য বাকি ছয় মাস বন্ধ থাকে।

## রামেশ্বরমধাম

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রামনাথপুর জেলার পামবান দ্বীপে রামেশ্বরমধামের অবস্থান। ভারতবর্ষের মূল ভূখন্ডের সঙ্গে পামবান দ্বীপ সেতুর মাধ্যমে যুক্ত। দক্ষিণ ভারতের এই দ্বীপ থেকে শ্রীলঙ্কা মাত্র চল্লিশ কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত। দ্বীপের একদিকে বঙ্গোপসাগর, অন্যদিকে ভারত মহাসাগর। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ পূজিত হন, যা জ্যোতির্লিঙ্গ নামে পরিচিত। এখানে রামেশ্বরম-এর পাশাপাশি রামেশ্বরী অর্থাৎ দেবী পার্বতী পূজিতা। মন্দিরে রয়েছে বাইশটি কূপ, যাকে কুণ্ড বলা হয়। প্রতিটি কুণ্ডের জলের তাপমাত্রাসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলাদা। ভক্তদের বিশ্বাস, কুণ্ডের জলে স্নান করলে আরোগ্য লাভ হয়।

রামেশ্বরম নামটি এসেছে রামের ঈশ্বর থেকে। রাম+ ঈশ্বরম্ = রামেশ্বরম্। অতএব রামের নামেই এই ধামের নামকরণ। রামায়ণ অনুসারে, লঙ্কেশ্বর রাবণ-কর্তৃক অপহৃতা স্ত্রী সীতাকে উদ্ধারের আগে রামচন্দ্র বানর সৈন্য-দের সাথে নিয়ে এই দ্বীপে জড়ো হন। সীতা-উদ্ধার শেষে পুনরায় একই স্থানে একত্রিত হন। সেখানে রাবণ বধের

প্রায়শ্চিত্ত করতে শিবলিঙ্গের পূজা করা হয়। সেই লিঙ্গই প্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ। এখানে নিত্যপূজা ছাড়াও নানা উৎসবাদি সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়।

কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে সরাসরি রামেশ্বরধামে যাওয়ার ট্রেন পাওয়া যায়।

### দ্বারকাধাম

ভারতের গুজরাট রাজ্যের দ্বারকা জেলায় অবস্থিত দ্বারকাধাম। দ্বারকা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শহরগুলোর মধ্যে একটি। দ্বারকা শব্দটি এসেছে দ্বার থেকে। দ্বার অর্থ দরজা। বহুদ্বারের সমন্বয়ে দ্বারকা নগরী সুরক্ষিত হতো। তাই নগরীর নাম দ্বারকা। গোমতী নদী ও আরব সাগরের সঙ্গমস্থলেই দ্বারকা মন্দির। এখানে দ্বারকাধীশ নামে ভগবান নারায়ণ পূজিত। শঙ্করাচার্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সমুদ্রের জলে বহবার নিমজ্জিত হয় দ্বারকা মন্দির। পরে তা পুনর্নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে সংস্কারকৃত সেই মন্দির দৃশ্যমান।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে দ্বারকার রাজা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। রাজা হিসেবে তাঁকে দ্বারকাধীশ বলা হয়। তিনি সমুদ্র থেকে বার যোজন (৯৬ বর্গ কি.মি.) জায়গা জলশাসনের মাধ্যমে উদ্ধার করে এই নগরী নির্মাণ করেছিলেন।

কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে রেলযোগে আহমেদাবাদ গিয়ে, আহমেদাবাদ থেকে রেলপথে দ্বারকাধামে পৌঁছানো যায়।

### জগন্নাথধাম

ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের পুরী জেলায় জগন্নাথধাম অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরের তীরে অত্যন্ত নান্দনিক পরিবেশে এর অবস্থান। জগন্নাথ শব্দের অর্থ জগতের নাথ। ভগবান নারায়ণকেই এখানে জগন্নাথ বলা হয়েছে। জগন্নাথ-দেবের মন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে জগন্নাথধাম গড়ে উঠেছে।

মন্দিরের প্রাচীরের চারটি দ্বার— সিংহদ্বার, হস্তীদ্বার, অশ্বদ্বার ও ব্যাঘ্রদ্বার। মূল মন্দিরে ওঠার জন্য রয়েছে সুদীর্ঘ সিঁড়ি।

জগন্নাথদেবের বিগ্রহ নির্মাণের একটি পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে। কৃষ্ণভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর উপাসনা করতে চান। কিন্তু কোন মূর্তিতে ভজনা করবেন তার সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। এমন সময় ইন্দ্রদ্যুম্নের সামনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে আসা একখণ্ড কাঠ দিয়ে বিগ্রহ নির্মাণের আদেশ দেন। এসময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদ্যুম্নের সামনে উপস্থিত হন। তিনি কাষ্ঠখণ্ড থেকে বিগ্রহ নির্মাণের দায়িত্ব নেন। কিন্তু মূর্তি নির্মাণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কেউ কাজে বাধা দিতে পারবেন না, এই বলে তিনি নির্মাণ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। এদিকে নির্মাণ শেষ হওয়ার আগেই রাজা অস্থির হয়ে ঘরের দরজা খুলে ঢুকে দেখতে পান, মূর্তির হাত-পা তৈরি তখনও বাকি। শিল্পীও অনুপস্থিত। এই শিল্পীই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। পরে সেই অসমাপ্ত মূর্তিই জগন্নাথ নামে জগন্নাথধামে পূজিত হয়ে আসছেন।

জগন্নাথদেবের পাশাপাশি এখানে কৃষ্ণভ্রাতা বলরাম এবং কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রার বিগ্রহ রয়েছে।

পুরীর জগন্নাথধামে সারা বছরে মোট বারোটি পার্বণ পালিত হয়ে। পার্বণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। আষাঢ় মাসের শুরুরপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা হয়। ঐদিন জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে বের করে রথে তোলা হয়। সাথে বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহকে রথে তোলা হয়। রথকে রাশিতে বেঁধে ভক্তরা তা টেনে নিয়ে যান। সাত দিন পর রথকে টেনে মন্দিরে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। একে বলে উল্টো রথ। লক্ষ লক্ষ ভক্ত রথ উৎসবে যোগ দেন।

কলকাতার হাওড়া থেকে ট্রেনযোগে বা বাসে করে পুরীর জগন্নাথধামে যাওয়া যায়।

## ধাপ-৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের প্রথমে পাঠ্যবইয়ে থাকা ‘শক্তিপীঠ দর্শন’ ছকে এককভাবে লিখতে দিন যে, কেন শক্তিপীঠ-গুলো ভ্রমণ করা প্রয়োজন বলে সে মনে করে।
- এরপর দলে/ জোড়ায় পাঠ্যবইয়ের ছক অনুসারে তাদের পছন্দের যে-কোনো একটি তীর্থস্থান/ ধর্মস্থান ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরি করে এককভাবে ছক পূরণ করতে দিন। ভ্রমণ পরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য তাদের পোস্টার পেপার বা বড় আকারের কাগজ সরবরাহ করুন।
- প্রতিটি দল/ জোড়ার পরিকল্পনা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন।
- উপস্থাপনা দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### যোগ্যতা ৮.৩

হিন্দুধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা

### শিখন অভিজ্ঞতা ৬: মূল্যবোধ চর্চা

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে—

- মানুষের নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে সনাক্ত করা
- নিজের আচরণ ও কাজে নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োগ করা

### বিষয়বস্তু

আত্মশ্রদ্ধা, ধর্মনিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

### অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে সহমর্মিতা, সেবাপরায়ণতা, দায়িত্বশীলতা, মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কিত চারটি ছবি দেখবে। ছবিতে যা দেখেছে তা নিয়ে শ্রেণির সবাই আলোচনা করবে। নিজের জীবনের এরকম একটি বাস্তব ঘটনার কথা গল্প আকারে লিখে উপস্থাপন করবে। এরপর তারা পাঠ্যবইয়ের ছক পূরণের মাধ্যমে নিজের ভেতরে থাকা তিনটি মূল্যবোধের নাম লিখে তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করবে। সকলের তালিকা মিলিয়ে ‘আমাদের মূল্যবোধ’ শিরোনামে বোর্ডে একটি তালিকা তৈরি করবে। পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট ছকে বোর্ডে লেখা সবগুলো মূল্যবোধের নাম লিখবে, সেইসঙ্গে নিজের জানা আরও কিছু মূল্যবোধের নাম যোগ করবে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব নৈতিক মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে এরকম একটি বাস্তব ঘটনার কথা বইয়ের নির্দিষ্ট ছকে গল্প আকারে লিখে উপস্থাপন করবে।

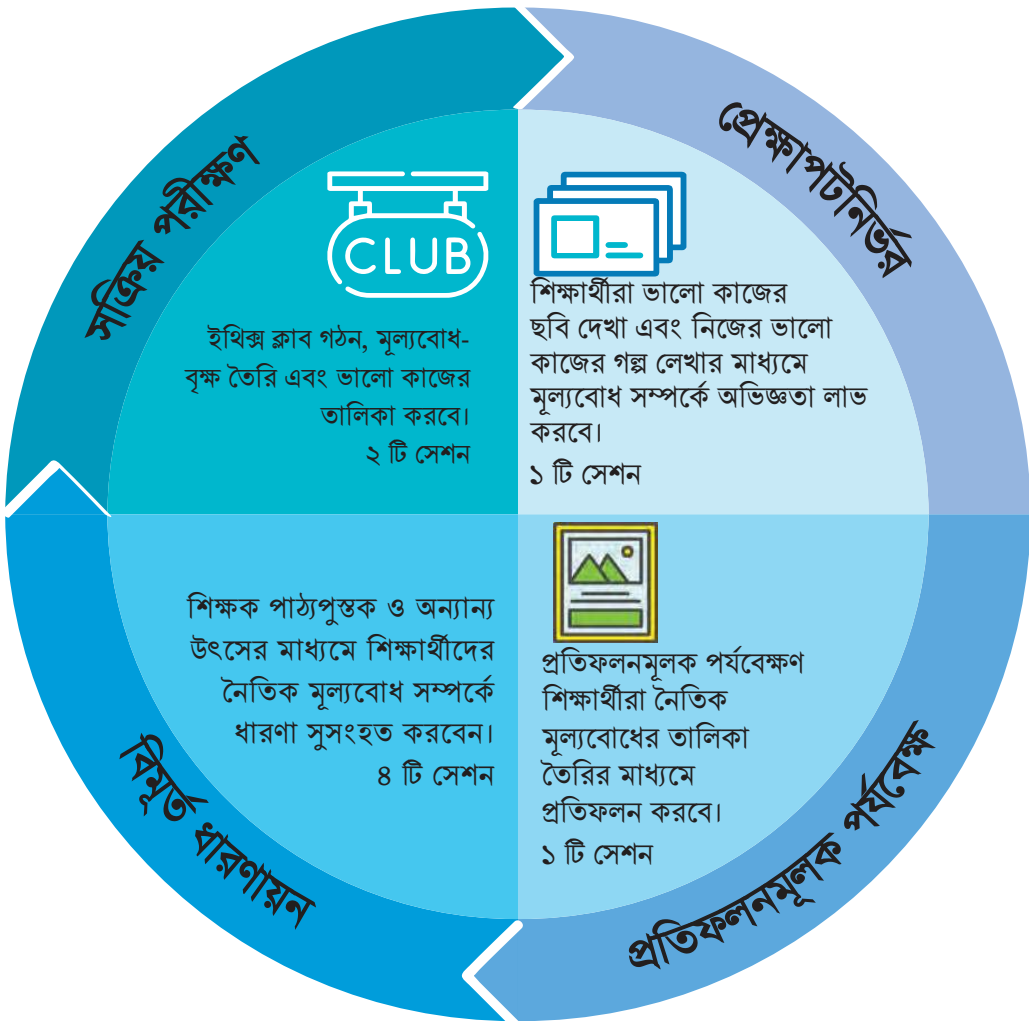
শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মশ্রদ্ধা, ধর্মনিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

শিক্ষার্থীরা ‘ইথিক্স ক্লাব’ গঠন করে বইয়ে করা তালিকাটি ব্যবহার করে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলন ছকে দেওয়া



ফুলের ছবির প্রত্যেকটিতে পঁপড়িতে একটি করে নৈতিক মূল্যবোধের নাম লিখবে। বিমূর্ত ধারণায়নের সময়ে নতুন কোনো মূল্যবোধের নাম পেলে সেটিও ফুলের পঁপড়িতে যোগ করবে। এরপরে বাড়ি থেকে একটি ফুল বানিয়ে তার আলাদা আলাদা পঁপড়িতে শিক্ষার্থীর নিজের মধ্যে রয়েছে এবং সে অর্জন করতে চায়— এরকম নৈতিক মূল্যবোধগুলোর নাম লিখে আনবে। শ্রেণিকক্ষের একটি দেয়ালে ‘মূল্যবোধ-বৃক্ষ’ তৈরি করে নিজেদের তৈরি ফুলগুলো তাতে সাঁটিয়ে দেবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়— এরকম কাজ করবে। মোট পঁচ সপ্তাহ সময় নিয়ে নিজের করা ভালো কাজের তালিকা তৈরি করবে।

**বিশেষ নির্দেশনা:** শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৮ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করবেন।



## ধাপ ১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে সহমর্মিতা, সেবাপরায়ণতা, দায়িত্বশীলতা, মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কিত চারটি ছবি দেখতে বলুন। ছবিতে যা দেখছে তা নিয়ে সবাইকে আলোচনা করতে বলুন।
- তার নিজের জীবনের এরকম একটি বাস্তব ঘটনার কথা ‘অপরের জন্য আমি’ শিরোনামে গল্প আকারে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।

## ধাপ ২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, এই ভালো আচরণগুলো নৈতিক মূল্যবোধ থেকে আসে।
- শিক্ষার্থীদের নিজের ভেতরে থাকা তিনটি করে নৈতিক মূল্যবোধের তালিকা তৈরির জন্য পাঠ্যবইয়ে থাকা ‘আমার নৈতিক মূল্যবোধ’ ছকটি পূরণ করতে বলুন।
- তালিকা তৈরি শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। শিক্ষার্থীর তালিকা যথাযথ বা যথেষ্ট না হলেও তাকে উৎসাহিত করুন; সকলে মিলে হাততালি দিন অথবা ভালো গুণ অর্জনের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান।
- প্রথম যে শিক্ষার্থী উপস্থাপন করবে তাকে তার নিজের তালিকার নৈতিক মূল্যবোধগুলোর নাম লিখে ‘আমাদের মূল্যবোধ’ শিরোনামে বোর্ডে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। হতে পারে যে, শিক্ষার্থী বর্ণনা দিতে পারছে কিন্তু মূল্যবোধটির নাম বলতে পারছে না, যেমন: শিক্ষার্থী বলল, আমি আমার ছোট বোনের দেখাশোনা করি অথবা আমার দাদুকে সময়মতো ঔষধ খাওয়াই, আপনি তখন তাকে জানাবেন, এই মূল্যবোধটির নাম ‘দায়িত্বশীলতা’।
- (একাধিক শিক্ষার্থী থাকলে) দ্বিতীয় শিক্ষার্থীকে বলুন, তার তালিকায় যে নতুন নৈতিক মূল্যবোধের নাম এসেছে, কেবল সেগুলো লিখতে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর তালিকায় আছে কিন্তু বোর্ডের তালিকায় আগেই লেখা হয়েছে, সেটি লিখবার প্রয়োজন নেই। এভাবে একে একে সকল শিক্ষার্থীর উপস্থাপন শেষ হলে তালিকাটি সম্পূর্ণ হবে।
- বোর্ডে থাকা তালিকাটি থেকে নৈতিক মূল্যবোধগুলোর নাম লিখে এবং তাদের আরও যতগুলো নৈতিক মূল্যবোধের নাম জানা আছে সেগুলো লিখে শিক্ষার্থীদের বইয়ের নির্দিষ্ট ছক পূরণ করতে বলুন।

## ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ৪ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা যেমন নিজেদের ভেতরে থাকা বিভিন্ন নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে গল্প লিখেছে তেমনি হিন্দুধর্মেও এরকম অনেক গল্প রয়েছে।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে কয়েকটি নৈতিক মূল্যবোধের কথা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

## সহায়ক তথ্য

প্রত্যেক প্রাণী যে-রূপে জন্মগ্রহণ করে সে রূপেই বেড়ে ওঠে, সেভাবেই জীবন পার করে। হাঁসের বাচ্চা হয় হাঁস আর ঘাসের বীজ থেকে জন্মায় ঘাস। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টা অন্যরকম। ‘মানুষ’ হিসেবে পরিচয় পাওয়ার জন্য তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। এই মনুষ্যত্ব হলো কতকগুলো সদগুণের সমষ্টি। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো মূল্যবোধ। আর যে মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বিচার করে তার আলোকে আচরণ করতে পারে তাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে। আমরা হবিত্রে এরকম কিছু নৈতিক মূল্যবোধের উদাহরণ দেখেছি। সত্যকামের গল্পে ‘সত্যবাদিতা’, রাম-লক্ষ্মণের গল্পে ‘ভ্রাতৃপ্রেম’, কর্ণের গল্পে ‘গুরুজনে ভক্তি’ ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধগুলোর কথা জেনেছি। মানুষের ভেতরে এরকম আরও অনেক নৈতিক মূল্যবোধ থাকে, যেমন: উদারতা, ক্ষমাশীলতা, দায়িত্ববোধ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি।

তোমরা যেমন নিজেদের ভেতরে থাকা বিভিন্ন নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে গল্প লিখেছ তেমনি হিন্দুধর্মেও এরকম অনেক গল্প রয়েছে। এখানে আমরা আত্মশ্রদ্ধা, ধর্মনিষ্ঠা, অধ্যাবসায় এবং পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জানব।

## আত্মশ্রদ্ধা

একজন ছাত্রের গণিতে ভীষণ ভয় ছিল। তাই সে পরীক্ষায় ভালো করত না। একদিন শিক্ষক তাকে ডেকে নিয়ে ছোট ছোট গাণিতিক সমস্যা দিলেন। অনেকগুলো সমস্যার সমাধান সে করে ফেলল। শিক্ষক তাতে খুশি হয়ে বললেন, তুমিই তো ভালোই গণিত পারো! চাইলেই কিন্তু গণিতে আরও ভালো করতে পারো। শিক্ষকের উৎসাহে সে গণিতের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। শিক্ষকও তাকে মাঝে মাঝে গণিত দেখিয়ে দিতেন। অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রের ভয় কাটতে লাগল। সে দেখলো, এইতো আমি পারছি! এতে নিজের প্রতি তার ভালো লাগা তৈরি হলো। এটাই হলো আত্মশ্রদ্ধাবোধ। ছাত্রটি ভাবল, তাহলে আর একটু চেষ্টা করি। এভাবে ছাত্রটি গণিতে পারদর্শী হয়ে উঠল। তার এই যে পারদর্শিতা, তা আত্মশ্রদ্ধারই ফলাফল। আসলে গণিতে ভালো করবার দক্ষতা তার ভেতরেই ছিল। কিন্তু “আমি পারি” নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধাটুকু জাগিয়ে তুলতে শিক্ষকমহাশয় তাকে সাহায্য করেছেন। তবে আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে যে সবসময়ে কারোর সাহায্য লাগবে, ব্যাপারটা এমনও নয়। আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে হলে নিজের প্রকৃত পরিচয় জেনে নিজের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো প্রয়োজন।

‘আত্মশ্রদ্ধা’ কথাটির মানে নিজেকে শ্রদ্ধা করা। এর জন্য প্রয়োজন নিজের প্রতি ভালো ধারণা রাখা। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু সহজাত বিশেষ ক্ষমতা, কর্মকুশলতা ও বৈশিষ্ট্য থাকে। আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে হলে নিজের এই সামর্থ্যগুলো স্পষ্ট করে জানতে হয়। সেইসঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোও বুঝতে হয়। আত্মশ্রদ্ধাবান মানুষ সাময়িক ব্যর্থতা দিয়ে নিজের মহিমাকে খাটো করে দেখে না। অন্যের মতো নয় বলে নিজেকে কখনও সামান্য বলে মনে করে না। এমন মানুষ নিজেকে ভালোবাসে। গীতায় বলা হয়েছে—

“উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ

আত্মৈব হ্যত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুর্নাত্মনঃ”।

(গীতা- ৬/৫)

**সরলার্থ:** নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে। নিজেকে কখনো অবসন্ন ভাববে না। তাহলে নিজেই নিজের বন্ধু হবে। বিপরীতে নিজে শত্রুতে পরিণত হবে।

অর্থাৎ, আত্মশ্রদ্ধার বলে নিজেকে উদ্ধার করতে হয়। কখনো নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে নেই। আত্মশ্রদ্ধাই মানুষের বন্ধু। আত্মশ্রদ্ধাহীনতাই মানুষের শত্রু। আত্ম-অবমাননা কখনও করতে নেই। আমি পাপী, আমি অধম, আমি পতিত, আমি অসহায়- এরকম বলতে নেই বা মনে করতে নেই। আত্মশ্রদ্ধাবান আত্মশ্রদ্ধাকেই পরম অবলম্বন বলে মনে করেন। কুসঙ্গ, কুকাথা ইত্যাদি থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখেন।

কেবল ব্যক্তি জীবনে নয়, জাতীয় জীবনেও আত্মশ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে। নইলে একটি জাতি যথার্থ স্বাধীনতা পায় না। নিজ জাতির ইতিহাস জানতে হবে। নিজেদের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। জাতীয় জীবনদর্শন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এরই ওপরে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবেই একটি আত্মশ্রদ্ধাবান জাতি সামনে এগিয়ে যায়।

আত্মশ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে রামায়ণে আমরা সীতাকে পাই। আমরা এখন সীতার কাহিনি জানব।

রাজা দশরথ বড় ছেলে রামকে রাজা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাদ সাধেন কৈকেয়ী। তার কূটকৌশলে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। সঙ্গে গেলেন স্ত্রী সীতা আর ভাই লক্ষ্মণ। তের বছর বনবাসের পর একদিন ছদ্মবেশে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতার কাছে এলেন। সীতা তখন বনের কুটিরে একা ছিলেন। সীতা অতিথি সৎকারের আয়োজন করেন। রাবণ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে সীতাকে বনবাস জীবন ছেড়ে তার সঙ্গে লঙ্কায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন। সীতা ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। রাবণ তখন সীতাকে জোর করে মায়া রথে তুলে নিয়ে নিজ রাজ্য লঙ্কায় চলে যায়।

রাবণ সীতাকে বশে আনার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনোভাবেই না পেরে তাঁকে অশোকবনে রাক্ষসীদের মাঝে বন্দি করে রাখেন। এদিকে সীতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাম। একদিন হনুমান লঙ্কা থেকে সীতার খবর আর একটা আংটি নিয়ে রামের কাছে আসেন। তারপর রাম আর লক্ষ্মণ লঙ্কায় উপস্থিত হন। রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে পরাজিত রাবণ সবংশে নিহত হয়। হনুমান অশোকবন থেকে সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে আসেন। কিন্তু রাম সীতাকে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। অপমানিত সীতা আগুনের চিতায় প্রবেশ করলেন। বললেন, যদি আমি সচ্চরিত্র হই এবং রামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকি, তবে স্বয়ং অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করবেন। অগ্নিদেব স্বয়ং সীতাকে রক্ষা করেন। রামের কাছে সীতাকে গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। রাম সীতাকে গ্রহণ করেন। তারপর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। আনন্দেই কাটছিল দিন। এরই মধ্যে সীতা অন্তঃসত্ত্বা হন। রাম নিঃসন্দেহ হলেও তিনি জানতে পারেন যে, প্রজাদের মনে সীতার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তাই প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য রাম সীতাকে বনবাসে পাঠান। সীতা বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আশ্রয় পান। এখানে সীতার লব ও কুশ নামে যমজ ছেলের জন্ম হয়। বাল্মীকি তাদের নিজের রচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করান। এদিকে রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিত বাল্মীকি মুনির সঙ্গে কুশ ও লব এই যজ্ঞে এসে রামায়ণ গান করেন। তাঁদের গান শুনে রাম বাল্মীকি মুনির কাছে তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন। বাল্মীকি মুনি বলেন, ঐরা তোমারই পুত্র।

বাল্মীকি মুনি লব ও কুশকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান। সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করবার জন্য রাম বাল্মীকির কাছে

সংবাদ পাঠান— সীতা যদি নিষ্পাপ হয়, সে যেন বাল্মীকির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করে এবং সকলের সামনে শপথ করে। বাল্মীকি এই প্রস্তাবে সম্মত হন। বাল্মীকি মুনির আদেশে সীতা লব ও কুশকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। পরদিন সকলের সামনে সীতার শুদ্ধতার পরীক্ষা। কিন্তু তিনি নিজেকে আর অপমানিত হতে দিতে রাজি নন। আত্মশ্রদ্ধাশীল সীতা সর্বসমক্ষে বললেন, আমি যদি সচ্চরিত্র হই এবং রাম ভিন্ন অন্য কাউকে মনে মনে চিন্তা না করে থাকি, তবে ধরিত্রী যেন বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দেন। তখন মাটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মাটির নিচ থেকে নাগবাহিত এক আশ্চর্য রথে দেবী বসুমতী উঠে আসেন। তিনি সীতাকে দুহাতে ধরে সিংহাসনে বসান। তারপর সীতাকে নিয়ে তিনি পাতালে প্রবেশ করেন। সীতা পাতালে প্রবেশ করলে রাজা রামচন্দ্রসহ প্রজারা শোকে হাহাকার করতে থাকেন।

এই কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই, সীতা রামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবার পরও বারবার তাঁকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে, পরীক্ষা দিতে হয়েছে এমনকি শাস্তিও পেতে হয়েছে। সেখানে আমরা তাঁর সহনশীলতা আর ধৈর্যশীলতার পরিচয় পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি আর অপমান সহ্য করলেন না, তখন তিনি আত্মশ্রদ্ধার পরিচয় দিলেন। নিজের প্রতি সম্মানবোধ থেকে তিনি অসম্মানজনক পরিস্থিতি থেকে সরে গেলেন।

- শিক্ষার্থীদের যে বক্তব্যগুলো আত্মশ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য সেগুলোতে টিক এবং যেগুলো আত্মশ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য নয় সেগুলোতে ক্রস চিহ্ন দিয়ে ‘আত্মশ্রদ্ধা-পরিচয়’ কাজটি করতে বলুন।

## ধর্মনিষ্ঠা

যা আমাদের কল্যাণের পথে ধরে রাখে তা-ই ধর্ম। আর ‘ধর্মনিষ্ঠা’ কথাটির মানে ধর্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, গভীর আস্থা, অটল বিশ্বাস। ধর্মনিষ্ঠ মানুষ সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের চেতনা এবং বিশ্বাসকে হৃদয়ে ধারণ করে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবন-যাপন করে। আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে: ‘আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ’— নিজের চিরমুক্তি, আর জগতের কল্যাণসাধনের জন্য। ধর্মনিষ্ঠা সবারকমের নৈতিক মূল্যবোধের সমষ্টি। যা নৈতিক তা-ই ধর্ম, যা অনৈতিক তা অধর্ম। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ধার্মিক বলা হয়।

ধার্মিক ব্যক্তি জগতে সাময়িকভাবে দুঃখভোগ করলেও পরিণামে শান্তি পান। এখানে একজন ধর্মনিষ্ঠ রাজার উপাখ্যান জানব।

অতি প্রাচীনকালে কোশলে হরিশ্চন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। ধর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, দান, ধ্যান ও ন্যায়বিচারের জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত। তাঁর কাছে যে যা চাইত তা-ই পেত। এই কারণে তিনি দানবীর হিসেবে খ্যাত হন। তাঁর সুনাম স্বর্গ ও মর্ত্যে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন ইন্দ্রের সভায়, বশিষ্ঠ মুনির মুখে ঋষি বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের দানের সুখ্যাতি শুনলেন। ঋষির ইচ্ছা হলো, হরিশ্চন্দ্র কেমন দানবীর, তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় পাঁচজন অঙ্গরার নাচের তালভঙ্গা হয়। দেবরাজ ইন্দ্র রেগে গিয়ে তাদের অভিশাপ দেন, তোমরা বিশ্বামিত্রের তপোবনে বন্দি হয়ে থাকবে। তখন অঙ্গরাগণ হাতজোড় করে দেবরাজের কাছে তাদের মুক্তির উপায় জানতে চান। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের হাতে তোমাদের মুক্তি হবে। তারা মানুষ রূপে বিশ্বামিত্রের তপোবনে বাস করতে থাকে। মানুষরূপী এই অঙ্গরারা প্রতিদিন তপোবনের ফুল তুলতে গিয়ে গাছের ডালপালা ভেঙে ফেলত। ঋষি বিশ্বামিত্র এই ঘটনায় ভীষণ রেগে পাঁচ কন্যাকে গাছের ডালে বেঁধে

রাখেন। একদিন রাজা হরিশ্চন্দ্র শিকারের জন্য তপোবনে আসেন। তাঁকে দেখে বন্দী অঙ্গরার আত্ননাদ করতে লাগল। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাদের বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। তারা মুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল।

বিশ্বামিত্র যখন এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের ওপরেও তার বড় রাগ হলো। তিনি ছুটে যান রাজা হরিশ্চন্দ্রের সভায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। রাগে আগুন হয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, আমি যে কন্যাদের বেঁধে রেখেছিলাম, কার অনুমতি নিয়ে তাদের তুমি ছেড়ে দিলে? রাজা হরিশ্চন্দ্র বললেন, হে মুনিবর, না জেনে আমি বড় অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। এখন আপনি যা চান, আমি তা-ই দেবো। বিশ্বামিত্র দেখলেন, হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতার পরীক্ষা নেওয়ার এটাই সুযোগ। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পুরো রাজ্যটাই চেয়ে বসলেন। এবারে বিশ্বামিত্র রাজার অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাইলেন সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা। রাজা সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডারিকে রাজকোষ থেকে সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসতে বললেন। তখন বিশ্বামিত্র বললেন, হরিশ্চন্দ্র তুমিতো আমাকে পুরো রাজত্ব দান করেছ, তাই রাজকোষও এখন আমার। এর অধিকার তুমি হারিয়েছো। অন্য কোথাও থেকে অর্থ এনে আমাকে দক্ষিণা দাও। আর রানি শৈব্যা আর পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে তুমি আমার রাজ্য থেকে চলে যাও। লজ্জিত রাজা বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে সাত দিনের সময় চেয়ে নিলেন। তারপর রাজপোশাক ছেড়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কাশীধামে চলে যান। সেখানে রানি শৈব্যাকে চার কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এক লোকের কাছে বিক্রি কর দেন। পেছন থেকে রাজপুত্র রোহিতাশ্ব মায়ের আঁচল ধরে কাঁদতে লাগল। শৈব্যার কাকুতি-মিনতিতে লোকটি রোহিতাশ্বকেও সঙ্গে নিল। কিন্তু সে কেবল একজনের খাবারই তাদের দেবে বলে জানাল। এরপর হরিশ্চন্দ্র নিজেকে এক শ্মশান-চড়ালের কাছে তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করলেন। এইভাবে তিনি বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা দিলেন। এভাবে দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র হলেন ডোম আর তাঁর রানি এবং পুত্র অন্যের বাড়ির দাস-দাসী হয়ে রইল।

এইভাবে কিছুদিন কাটল। একদিন ফুল তোলার সময়ে একটি কালসাপ রোহিতাশ্বকে দংশন করল। সেখানেই রোহিতাশ্বের মৃত্যু হয়। মৃত পুত্রকে দেখে শৈব্যার জীবনে অন্ধকার নেমে এল। যার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে ছিলেন, সেই স্নেহের পুত্রও আজ চলে গেল। তিনি পুত্রশোকের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, কোথায়, কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র। একবার এসে দেখে যাও তোমার সন্তানের মৃতদেহ। মরা ছেলেকে কোলে নিয়ে শৈব্যা গেলেন শ্মশানঘাটে।

সেদিন ছিল ভয়ানক দুর্যোগ। ঘোর অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে ঢাকা। ঘাটের কড়ি আদায় করার জন্য হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শৈব্যা মৃত পুত্রকে নিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁকে বললেন, ঘাটের কড়ি পঞ্চাশ কাহন না পেলে আমি মড়া পোড়াতে পারবো না। তুমি অন্য ঘাটে চলে যাও। শৈব্যা অপরের কেনা দাসী, তিনি পয়সা কোথায় পাবেন! মনের দুঃখে তিনি হরিশ্চন্দ্রের নাম ধরে কাঁদতে লাগলেন। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোতে হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা ও মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে চিনতে পেরে কেঁদে উঠলেন। শৈব্যাও ডোমের পোশাক পরা রাজাকে চিনে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে দুজনেই অঝর নয়নে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা দুজনেই বললেন, হে প্রভু আমরা সর্বস্ব দান করেছি। বিনিময়ে আজ আমাদের এই দিন দেখালে! তাই এই জীবন আমরা আর রাখবো না। এই পুত্রের চিতায় আমরা দু'জন প্রাণত্যাগ করবো। তাই চন্দনকাঠের চিতা সাজিয়ে তাতে মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে রাখেন। দুই পাশে পিতা-মাতা শুয়ে পড়লেন। এবার চিতাতে আগুন দিতে যাবেন, এমন সময় স্বয়ং ধর্মরাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে রাজন! ধর্ম ও সত্যের প্রতি তোমার অনুরাগে দেবতারাও তুষ্ট হয়েছেন। তুমি প্রকৃতই ধার্মিক ও সত্যবাদী। ধর্মরাজ রোহিতাশ্বের গায়ে হাত বোলাতে সে বেঁচে উঠল’। বিশ্বামিত্রও তখন সেখানে এসে বললেন, ‘হরিশ্চন্দ্র,



তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তুমি সত্যই দানবীর। ধন্য তোমার জীবন। তোমার এই দান ও ত্যাগের মহিমা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। তোমার রাজ্য তুমি ফিরিয়ে নাও। রাজ্যে ফিরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে রাজ্যসুখ ভোগ করো এবং প্রজাদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো’।

- পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট ছকে শিক্ষার্থীদের তিনটি পয়েন্টে ‘ধর্মনিষ্ঠতার বৈশিষ্ট্য’ লিখতে বলুন।

ধর্মনিষ্ঠার কারণে আজও রাজা হরিশ্চন্দ্রর গল্প সকলের মনে জায়গা করে আছে। তিনি রাজ্যসুখ, স্ত্রী-পুত্র সব ত্যাগ করেও ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হননি। ধর্মনিষ্ঠতার গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

### অধ্যবসায়

জীবনে চলার পথে আছে বাধা, আছে বিঘ্ন। এসব বাধা-বিঘ্নকে আতিক্রম করে কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করার নামই অধ্যবসায়। চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবসায় নামক নৈতিক গুণটি গড়ে ওঠে। পৃথিবীতে যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু কল্যাণকর সবই অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি হলো অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ বড় হয়। অসাধ্য সাধন করতে পারে। কবি কালিপ্রসন্ন ঘোষ বলেছেন—

পাঁচজনে পারে যাহা,

তুমিও পারিবে তাহা

পার কিনা পার কর যতন আবার

একবার না পারিলে দেখ শতবার।

অধ্যবসায়ের গুণে মানুষ কেমন করে অসাধ্যকে সাধন করে তা এখানে আমরা বোপদেব গোস্বামীর অধ্যবসায়ের গল্পের মাধ্যমে জানব।

প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। তখনকার দিনে প্রাচীনভারতে বিদ্যালয়কে টোল বলা হত। মহারাষ্ট্রের অধিবাসী বোপদেব গোস্বামী টোলে পড়ালেখা করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছাত্র। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে ব্যাকরণের যেসব সূত্র শেখাতেন, বোপদেব সেসব কিছুই বুঝতেও পারতেন না। মনেও রাখতে পারতেন না। এ কারণে তিনি প্রতিনিয়ত টোলে অপমানিত হতেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁর মূর্খতায় খুবই বিরক্ত ছিলেন। তিনি রেগে গিয়ে বোপদেবকে বলতেন, এমন আপদ টোলে আসার চেয়ে টোল বন্ধ হয়ে যাওয়া বরং ভালো। একদিন পণ্ডিত মহাশয় বোপদেবকে টোল থেকে বের করে দেন। বলে দেন, সে যেন আর টোলে না আসে। মনে একরাশ দুঃখ নিয়ে মাথা নিচু করে টোল থেকে বেরিয়ে যান বোপদেব। টোল থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে হতাশা ঘিরে ধরে তাঁকে। তিনি ভাবতে থাকেন, আমি সত্যিই খুব খারাপ ছাত্র। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নেই। আমাকে দিয়ে আর লেখাপড়া হবে না। কিন্তু আমি তো ব্যাকরণের সব সূত্র মনে রাখতে চাই। ক্লাসের পড়াতো বুঝতে চাই। অথচ কিছুতেই মনে থাকে না! কিছুই বুঝি না। মনের দুঃখে বোপদেব বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। একদিন তাঁর খুব পিপাসা পেয়েছিল। তিনি একটি সানবাঁধানো পুকুরঘাটে যান। জলপান শেষে তিনি পুকুরের ঘাটে বসে থাকেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল ঘাটের পাথরের উপর একটি গোল গর্ত। পুকুরের



সানবঁধানো ঘাটের পাথরগুলো সব ঠিকঠাকই আছে। শুধু একটি নির্দিষ্ট জায়গাতেই গোল চাকতির মতো ওই গর্ত। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো, এরকম শক্ত পাথরের গায়ে কেমন করে এরকম গর্ত হলো? মনে মনে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন। এমন সময়ে একজন মহিলা ঐ পুকুর-ঘাটে এল। তার কাঁখে একটি মাটির কলসি। কলসিতে জল ভরে তিনি নামিয়ে রাখেন গর্ত হওয়া পাথরের উপর। তারপর জলভরা কলসি নিয়ে মাহিলাটি বাড়ি চলে যান।

বোপদেব তখন বুঝলেন, দিনের পর দিন সানবঁধানো ঘাটে জলভরা মাটির কলসি নির্দিষ্ট স্থানে বারবার রাখার ফলে কলসির ঘষায় ঘষায় কঠিন পাথরের উপর কলসির মাপে গর্ত হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি চিন্তা করলেন, কী আশ্চর্য! মাটির কলসির অবিরাম ঘর্ষণে পাথরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। নিরেট পাথরের বুকে দিনের পর দিন মাটির কলসির রাখার ফলে যদি গর্ত হতে পারে তাহলে বারবার পাঠ করলে আমিহঁবা পড়া মনে রাখতে পারব না কেন! কেনইবা বারবার চেষ্টা করেও বুঝতে পারব না! নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি পাথরের চেয়েও নিরেট? তিনি বুঝলেন, বারবার চেষ্টা করলে আমি নিশ্চয়ই ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হব। তিনি হতাশা ত্যাগ করে ছুটে গেলেন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে। গিয়ে বললেন নিজের উপলব্ধির কথা।

পণ্ডিত মহাশয় অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন বোপদেবের দিকে। এইতো, এইতো তাঁর চোখ খুলেছে! মনের বিস্তার ঘটেছে। মন ভাবতে শিখেছে! এতদিন তিনি তো বারবার বোপদেবকে ভাবতেই চেয়েছিলেন। সেই চিন্তনের পাঠ বোপদেব পেয়েছেন প্রকৃতির কাছ থেকে। যে পুত্রসম ছাত্রকে তিনি টোল থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তাঁকেই পরমস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

এরপর বোপদেব ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা করতে লাগলেন। কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে বিদ্যাহীন মূর্খ বোপদেবের নির্বুদ্ধিতার কঠিন পাথরও বিদূরিত হলো। পণ্ডিত মহাশয়ের সহায়তায় তিনি দুর্বোধ্য ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হলেন। একসময়ে বোপদেব নিজেই সংস্কৃত ব্যাকরণকে সূত্রায়িত করেন। যে ব্যাকরণশাস্ত্র ছিল একসময়ে একেবারেই দুর্বোধ্য, সেই শাস্ত্রের সূত্রগুলো নিয়েই বোপদেব রচনা করেন একটি আধুনিক ব্যাকরণ গ্রন্থ। বোপদেবের এই বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম ‘মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ’। এমন সহজবোধ্য ব্যাকরণ সেকালে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। ব্যাকরণশাস্ত্রকে সরলতম করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর লেখা এই ব্যাকরণ বই ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। বোপদেব কবিকল্পদ্রুম ও তার কামধেনু টীকা, মুক্তাফল ও হরিলীলা বর্ণনা, শতশ্লোকী ও ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

অপমান থেকে আত্মজিজ্ঞাসা, ক্ষণিকের দেখা থেকে দর্শন বোপদেবের চোখ খুলে দিয়েছিল। কঠোর সংকল্প ও অধ্যবসায়ের এক অনবদ্য নজির স্থাপন করেন ক্লাসের সবচেয়ে নির্বোধ পড়া-না-পারা ছাত্রটি। কঠোর অধ্যবসায়ের বলে মানুষ কী করে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে, বোপদেব গোস্বামীর গল্পটি তার অনবদ্য উদাহরণ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের জীবনের কোনো একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে বলুন যেখানে সে অধ্যাব-সায়ের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করতে চায়।
- সে কীভাবে কাজটি করবে তা বুঝিয়ে পাঠ্যবইয়ের ‘সাফল্য-সূত্র’ ঘরে লিখতে বলুন।

### মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

মাতা ও পিতা আমাদের পরম গুরু। হিন্দুধর্ম মতে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়।

পিতা সম্পর্কে হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ। অর্থাৎ পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীত হলে সকল দেবতা তুষ্ট হন।

যা কিছু করা হয় তাই কর্ম। আর যেসব কর্ম অনুশীলন করা আবশ্যিক তাই কর্তব্য। কর্তব্যের প্রতি আমাদের দেখেছি। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনবাস করেছিলেন, ভীম মায়ের আজায় রাক্ষসের মুখে যেতেও কুণ্ঠিত হননি। শাস্ত্র অনুযায়ী, মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমান নয় এমন সন্তান কাম্য নয়। মাতা-পিতার সঙ্গে সবসময়ে নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলা প্রত্যেকটি সন্তানের একান্ত কর্তব্য। তাদের জীবনে যখন বার্ধক্য আসে, কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে হয়, তখন অনেকেই অন্যের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। শৈশবে সন্তান যেমন মাতাপিতার প্রতি একান্তভাবে নির্ভর করত, ঠিক তেমনিভাবে বৃদ্ধাবস্থায় তাদের দায়িত্ব নেওয়া প্রত্যেকটি সন্তানের জন্য আবশ্যিক। যে সন্তান পরিণত বয়স পর্যন্ত মাতাপিতার সেবা করার সুযোগ পান তিনি ভাগ্যবান। নিজের কর্ম এবং চরিত্র দ্বারা মাতাপিতাকে তুষ্ট করা প্রত্যেকটি সন্তানের অবশ্য কর্তব্য।

- মাতা-পিতার প্রতি নিজে পালন করে এরকম তিনটি কর্তব্যের কথা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ‘আমার কর্তব্যবোধ’ ছকে লিখতে বলুন।

এখানে আমরা মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ এক পুত্রের কাহিনি জানব। রামায়ণে এই গল্প আছে।

সিঙ্কুমুনি ছিলেন অত্যন্ত মাতৃপিতৃভক্ত। তাঁর পিতামাতা দুজনেই ছিলেন অন্ধ। মুনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পিতা-মাতার সেবা করতেন। তাঁর পিতা অন্ধকমুনি নামে পরিচিত ছিলেন। সিঙ্কুমুনি তাঁর অন্ধ পিতামাতাকে একটা ভারে করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতেন। একবার তাঁর মাতা-পিতার তীর্থযাত্রার ইচ্ছে হলো। পুত্র সিঙ্কুমুনি তাঁদের ভারে তুলে কাঁধে করে রওনা হলেন। পথে মাতা-পিতা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। সিঙ্কুমুনি তাঁদের জন্য জল আনতে কলসি নিয়ে সরযু নামের জলাশয়ে যান। এসময়ে অযোধ্যার রাজা দশরথ সেই বনে শিকার করতে এসেছেন। শিকার খুঁজে খুঁজে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। দশরথ তখন সেই জলাশয়ের তীরে একটি গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সিঙ্কুমুনি যখন কলসীতে জল ভরছিলেন, রাজা দশরথের কানে সে শব্দ পৌঁছোয়। তিনি চোখে না দেখে কেবল শব্দ শুনেই তীর ছুঁড়ে শিকার করতে পারতেন।

একে বলে শব্দভেদী বাণ। রাজা দশরথ কলসিতে জল ভরার শব্দকে হরিণের জল খাওয়ার শব্দ বলে ভাবলেন। তিনি শব্দের দিকে লক্ষ করে বাণ ছুঁড়ে মারেন। সেই বাণ সিন্ধুমুনিকে বিদ্ধ করে। বাণবিদ্ধ মুনি সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন। হরিণ শিকার করেছেন ভেবে রাজা দশরথ সেটি আনতে যান। কিন্তু এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে দশরথ ভীষণ অনুতপ্ত হন। তিনি শূশ্রুষা করে সিন্ধুমুনির জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। দশরথের অনুতাপ দেখে মুমূর্ষু সিন্ধুমুনি তাঁকে আর কোনো অভিশাপ দেননি। মৃত্যুকালে তিনি নিজের জীবনের জন্য কোনো দুঃখও করেননি। কেবল অন্ধ মাতা-পিতার আসন্ন কষ্টের কথা ভেবে তাঁর হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠল। মুনি গভীর দুঃখে বললেন, আমার বৃদ্ধ পিতামাতার শূশ্রুষা আর ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব ছিল আমার ওপরে। আমাকে ছাড়া তাঁরা কী করে বাঁচবেন! তাঁরা কী করে পুত্রশোক সহ্য করবেন! মৃত্যুর আগে সিন্ধুমুনি দশরথের কাছে বললেন, আমাকে পিতা-মাতার কাছে নিয়ে চলো। এদিকে সিন্ধুমুনির মাতা-পিতা ছেলের দেরি দেখে দুশ্চিন্তা করছিলেন। পাতার মচমচ শব্দ শুনে তারা ভাবলেন, এই বুঝি ছেলে এল! কিন্তু দশরথের কোলে সন্তানের মৃতদেহ রয়েছে বুঝতে পেরে তাঁরা হাহাকার করে উঠলেন। অন্ধকমুনি রাজা দশরথকে পুত্রহারা হওয়ার অভিশাপ দিলেন।

সিন্ধুমুনি মৃত্যুকালে রাজা দশরথকে নিজের মাতা-পিতার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন। অন্ধকমুনির অভিশাপ সত্ত্বেও দশরথ তাঁদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

প্রত্যেক মানুষেরই সবটুকু সাধ্য দিয়ে মাতা-পিতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা উচিত। সিন্ধুমুনির জীবন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কর্তব্যবোধের কারণে তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর এই দৃষ্টান্ত সকলের জন্য অনুকরণীয়

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ধাপে ধাপে ‘মঞ্জলময় উদ্যোগ’ কাজটি করতে বলুন।
- তার মা/ বাবা/ অভিভাবক— যে-কোনো একজনের সারাদিনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে পাঠ্যবইয়ের তালিকাটি পূরণ করা।
- তাঁর কাজের ফলে শিক্ষার্থীর যেসব মঞ্জল হয় অর্থাৎ তিনি শিক্ষার্থীর যেসব আবেগীয় এবং বাস্তব প্রয়োজন মেটান সেগুলোর তালিকা করা।
- বাবা/ মায়ের/ অভিভাবকের প্রয়োজন বুঝে তাঁর জন্য নিজের হাতে একটি উপহার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে এনে প্রদর্শন করা।
- উপহারটি দেওয়া এবং উপহারটি পেয়ে মা/ বাবা/ অভিভাবকের অনুভূতি মন্তব্য হিসেবে লিখে আনা।

## ধাপ-৪: সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের ‘ইথিক্স ক্লাব’ (নৈতিক মূল্যবোধ ক্লাব) গঠন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের জানান, ‘ইথিক্স ক্লাব কার্যক্রম’ হুকে তিনটি কার্যক্রমের কথা লেখা আছে। আলোচনার মাধ্যমে তাদের ক্লাবের জন্য নতুন দুটো কাজের পরিকল্পনা করে হুকে লিখতে বলুন।
- তাদের বলুন, ক্লাবের কাজের অংশ হিসেবে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলন হুকে দেওয়া ফুলের ছবির প্রত্যেক-টিতে পঁপড়িতে একটি করে নৈতিক মূল্যবোধের নাম লিখতে। প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীকে আরও পঁপড়ি এঁকে নিতে বলবেন। এই কাজটি করবার জন্য শিক্ষার্থীকে তার আগে তৈরি করা তালিকাটি ব্যবহার করতে বলুন, এর মধ্যে যদি সে নতুন কোনো মূল্যবোধের নাম জেনে থাকে সেগুলোও লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন, বাড়ি থেকে একটি ‘আমার মূল্যবোধের ফুল’ তৈরি করে আনতে। অর্থাৎ একটি ফুল বানিয়ে তার আলাদা আলাদা পঁপড়িতে শিক্ষার্থীর নিজের মধ্যে রয়েছে এবং সে অর্জন করতে চায়—এরকম নৈতিক মূল্যবোধগুলোর নাম লিখে আনবে।
- শ্রেণিকক্ষের একটি দেয়ালে ‘মূল্যবোধ-বৃক্ষ’ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের তৈরি ফুলগুলো সেখানে সাঁটিয়ে দিতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের জানান, এই ‘মূল্যবোধের ফুল’গুলো যেমন শ্রেণিকক্ষকে সুন্দর করেছে, তেমনি করে এই মূল্যবোধগুলোও যেন আমাদের অন্তরকে সুন্দর করে, আমাদের আচরণে যেন সেই সৌন্দর্যের ছাপ পড়ে সেই উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন।
- ক্লাব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সপ্তাহে অন্তত একটি করে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এরকম কাজ করতে বলুন। মোট পাঁচ সপ্তাহ সময় নিয়ে, পাঠ্যবইয়ের ‘চেতনার পরিচয়’ হুকে নিজের করা ভালো কাজের তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- এই মূল্যবোধগুলো কীভাবে তাদের মানুষ হিসেবে সুন্দর জীবন যাপন করতে সহায়তা করেছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাবের সদস্যদের সাথে আলোচনা করতে উৎসাহিত করুন।

# তৃতীয় অধ্যায়

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### যোগ্যতা ৮.৩

হিন্দুধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা

### অভিজ্ঞতা ৭: আদর্শ জীবন চরিত্র ও ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে—

- হিন্দুধর্মীয় আদর্শ জীবনচরিত্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা
- মহামানবদের প্রবর্তিত আদর্শ ধারণা করা
- মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখা

### বিষয়বস্তু

হরিচাঁদ ঠাকুর, মা আনন্দময়ী, প্রভুপাদ, সাধক রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীঅঙ্গন

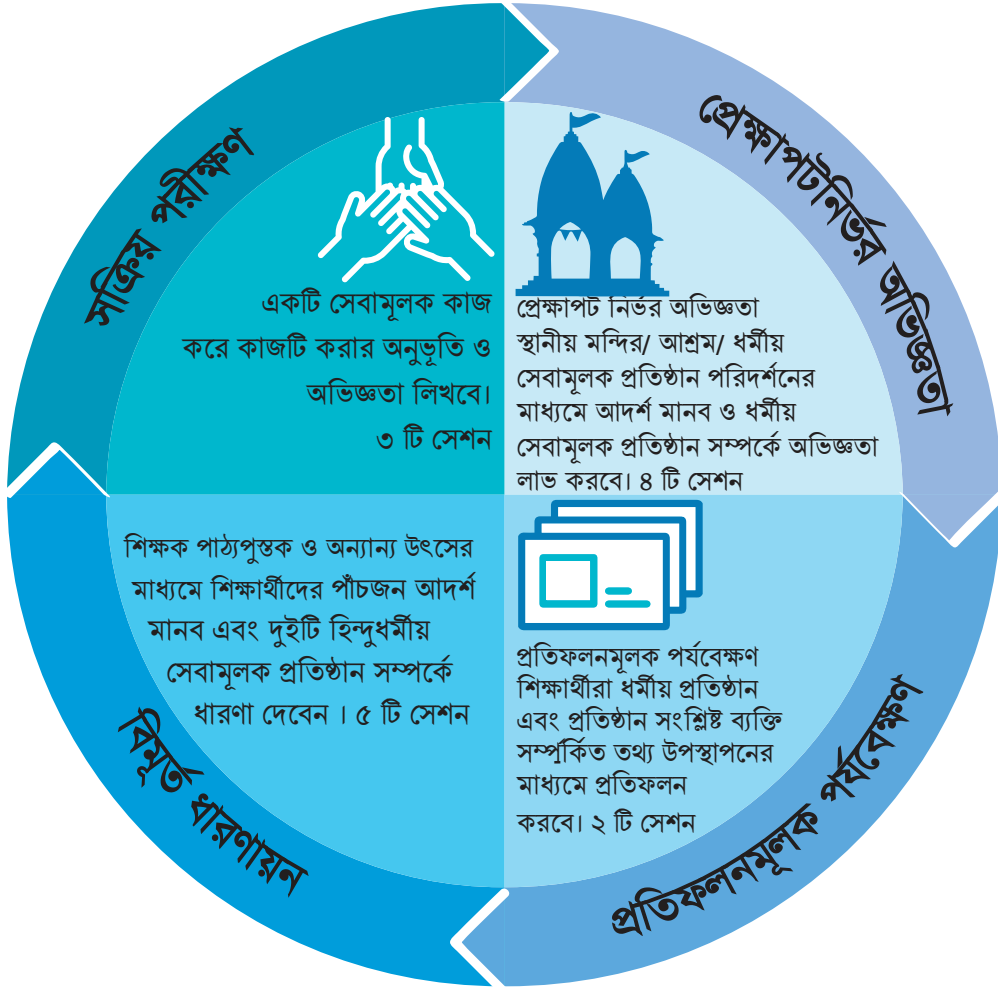
### অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা একটি মন্দির/ সেবাশ্রম পরিদর্শনের গ্রাউন্ড রুল তৈরি করবে। প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য যাবে। প্রতিষ্ঠানটি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নোট নেবে। নোট ব্যবহার করে পাঠ্যবইয়ে থাকা প্রতিফলন জার্নাল লিখবে। দুটো দলে প্রতিষ্ঠানটি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঁচজন আদর্শ মানব এবং দুইটি হিন্দুধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা আঁকা, লেখা, গান, ভাবনা, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ধারণা স্পষ্ট করবে।

শিক্ষার্থীরা আদর্শ মানবের জীবন এবং ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জেনে পাওয়া মূল্যবোধগুলোর তালিকা করবে। সেখান থেকে তারা বাস্তবে হাতে-কলমে করবার মতন একটি কাজ বেছে নেবে। কাজটি করবার পর সেই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি পাঠ্যবইয়ের প্রতিফলন জার্নালে লিখবার মাধ্যমে তারা সক্রিয় পরীক্ষণ সম্পন্ন করবে।

## বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। ১৪ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।



## ধাপ-১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

### সেশন ৪ টি

- শিক্ষার্থীদের একটি স্থানীয় মন্দির/ আশ্রম/ ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন।
- এরজন্য আগে থেকেই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিন। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিদর্শনের অনুমতি নিন এবং সহযোগিতা কামনা করুন।
- শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি উপযুক্ত দিন নির্ধারণ করুন। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিন। দিন নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবহাওয়ার বিষয়টিও লক্ষ রাখুন।
- বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছ থেকে যথাযথ অনুমতি নিন। শিক্ষার্থীকে বাড়ি থেকে ‘ফিল্ড ট্রিপের অনুমতিপত্র’ পূরণ করে অভিভাবকের স্বাক্ষর নিতে বলুন। সকলে কাজটি করে এনেছে কিনা— দেখে নিন।
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যেহেতু বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হয়, ভাবগম্ভীর পরিবেশ বজায় রাখতে হয় তাই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা দিন, সেখানে পালনীয় রীতিনীতি, পোশাক, আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানান।
- এরপর তাদের বলুন, এসো তাহলে আমরা সেখানে গিয়ে কেমন আচরণ করব (গ্রাউন্ড রুল) তার তালিকা তৈরি করি। প্রত্যেককে বলুন মৌখিকভাবে দু’একটা পালনীয় আচরণ বলতে, সকলের বলা নিয়মগুলো (পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে) বোর্ডে লিখে একটা তালিকা তৈরি হবে। এবারে তাদের বলুন বোর্ডের তালিকাটি দেখে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময়ে পালনীয় আচরণের তালিকাটি লিখতে। তাদের বলবেন, আমরা পরিদর্শনের সময়ে এই বইটি সঙ্গে রাখব এবং নিয়মগুলো মেনে চলব।
- পরিদর্শনের সময়ে পাঠ্যবই, কলম, জলের বোতল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে রাখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এবং প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে পাঠ্যবইয়ে থাকা প্রতিফলন জার্নাল অনুযায়ী আলাদা কাগজে নোট নিতে— আমি যেখানে গিয়েছি, সেখানে যেসব কাজ হয় (ধর্মীয় ও সেবামূলক), প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, উদ্দেশ্য, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, চ্যালেঞ্জসমূহ, প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার জীবন, কর্ম ও দর্শন। যদি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাতার কথা না জানা যায় সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সেবায়ত বা প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট কোনো মহামানবের জীবন, কর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।



## ধাপ-২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীরা তাদের সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে পাঠ্যবইয়ে থাকা প্রতিফলন জার্নাল লিখবে। বাড়ির কাজ হিসেবেও কাজটি করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের (অন্তত) দুটি দলে ভাগ করে দিয়ে তাদের বলুন, একটি দল কাজ করবে ‘ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান’ শিরোনামে আর একটি দল কাজ করবে ‘আদর্শ মানুষ’ শিরোনামে। প্রথম দলটি তাদের পরিদর্শন করা প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস, মূল্যবোধ, বর্তমান কর্মপরিধি, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, তাদের কর্মকাণ্ড স্থানীয় জনসমাজে কী প্রভাব রাখছে, প্রতিষ্ঠানটি কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেবে। দ্বিতীয় দলটি প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতার জীবন, দর্শন ও কাজ সম্পর্কে জানাবে।
- পাঠ্যবইয়ের প্রতিফলন জার্নাল পূরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দলকে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন উপযোগী একটি আকর্ষণীয় উপস্থাপনা তৈরি করতে বলুন। তাদের বলুন মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, গান-কবিতা, অভিনয়, সংলাপ ইত্যাদি যে-কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপনাটি প্রদর্শন করতে।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

## ধাপ-৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ৫ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা যেমন নিজেদের ভেতরে থাকা বিভিন্ন নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে গল্প লিখেছে তেমনি হিন্দুধর্মেও এরকম অনেক গল্প রয়েছে।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে কয়েকটি নৈতিক মূল্যবোধের কথা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

## সহায়ক তথ্য

### আদর্শ জীবনচরিত ও ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

মানুষ যুগে যুগে জীবনের উৎস, উদ্দেশ্য আর পরিণতির কথা ভেবেছে। তার মনে তৈরি হয়েছে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা প্রশ্ন। সেসব প্রশ্নের উত্তর সে কখনো খুঁজেছে ধর্মে, কখনো বিজ্ঞানে, কখনো দর্শনে, কখনো বা নিজের অন্তরে। আবার যুগে যুগে যেসব মহামানব জন্মেছেন তাঁদের জীবনদর্শনও অপরের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছে। আমরা এখানে হিন্দুধর্মের কয়েকজন আদর্শ মানুষের কথা জানবো। যাঁরা নিজেদের জীবনকে

উৎসর্গ করেছেন ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য। তাই তাঁরা কেবল নিজের ভালোর কথা না ভেবে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির মঞ্জলের কথা ভেবেছেন। ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টির সেবার জন্য তৈরি করেছেন বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। এসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা ইহলোক ত্যাগ করার পরও স্রষ্টা ও সৃষ্টির সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা মহামানবদের প্রতিষ্ঠিত এরকম দুটি হিন্দুধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কথা বিশদভাবে জানবো।

## হরিচাঁদ ঠাকুর

গোপালগঞ্জ জেলার সাফলিডাঙ্গা গ্রামে বাস করতেন যশোমন্ত ঠাকুর ও অন্নপূর্ণা দেবী দম্পতি। তাঁরা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। লোকশ্রুতি আছে, অন্নপূর্ণা দেবী একদিন ভাবাবেশে দেখতে পান শিশু কৃষ্ণ তাঁকে ‘মা’ ‘মা’ বলে ডাকছেন। আর তাঁর স্তন্য পান করছেন। সেদিন সাধু রমাকান্ত এলেন তাঁদের বাড়িতে। অন্নপূর্ণা দেবীর ভাবাবেশের ঘটনা শুনে তিনি বললেন, ‘মা, তোমার গর্ভে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করবেন’। এর কিছুদিন পরে ১৮১২ সালের ১১ মার্চ, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে তাঁদের কোলে এলো এক পুত্রসন্তান। নাম রাখা হলো হরিদাস। ছোট শিশু হরিদাস কালক্রমে ভক্তদের মুখে মুখে হয়ে ওঠেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

তখনকার সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে হরিচাঁদ ঠাকুরের পাঠশালায় যাওয়া হয়নি। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটতো বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে গরু চড়িয়ে। তাঁর সুন্দর চেহারা, অমায়িক ব্যবহার, মধুর স্বরের গান, ভজন, কীর্তন সবাইকে মুগ্ধ করতো। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও প্রখর বুদ্ধিমত্তা তাঁর মনকে বিজ্ঞান-মনস্ক ও যুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলেছিল। সেই সময়ের গ্রাম-গঞ্জে চিকিৎসার তেমন সুযোগ ছিল না। ওষুদের ঝাঁড়ফুক, তাবিজ-কবচই ছিল মূল ভরসা। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজস্ব প্রজ্ঞার বলে গ্রামের লোকদের রোগমুক্তির জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার নানা বিধান দিতেন। সেইসঙ্গে রোগীর মনোবল বৃদ্ধির জন্য রোগীকে সঙ্গে নিয়েই হরিবোল নামের কীর্তন করতেন। এই চিকিৎসা এবং নামকীর্তনের ফলে রোগীর মানসিক শক্তি বেড়ে যেত, যার ফলে অধিকাংশ রোগেরই উপশম হতো। তিনি তুকতাক চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু হরিনামে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। লোকে যে-কোনো সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে হরিনাম করতে বলতেন। তাতেই ঘটতো আশ্চর্য ঘটনা— গিরিধর বালার জ্বর সেরে গেলো, গোস্বামী গোলোকের গলার ব্যথার নিরাময় হলো, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের পিত্ত যন্ত্রণার অবসান হলো, অন্ধ রামধন ফিরে পেলো দৃষ্টিশক্তি। এমনকি কবি আনন্দ সরকারের পুত্র লাভ হলো। লোকের মুখে মুখে রটে গেলো— হরিচাঁদ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

ছোটবেলা থেকেই হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ভাবটি বাড়তে থাকে। তাঁর মধ্যে ধর্মভাব প্রবল হতে থাকে। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তির বহমান ধারাকে আরও সহজভাবে এগিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, “ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।” তাঁর মতের সরল ব্যাখ্যা এরকম, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ঐক্যের সুর আছে। এই সুরটি প্রেমের সুর। আর এই প্রেমের ঘনীভূত নির্যাস নিহিত আছে হরিনামে। হরিনাম যে করে সে প্রেমের সমুদ্র মন্বন করে। সমুদ্র মন্বনে যেমন অমৃত উঠে এসেছিল, তেমনি হরিনামের মাধ্যমে ভক্তের সামনে উঠে আসে ঈশ্বর স্বরূপ অমৃত মাধুরী। সেই অমৃত মাধুরীর মধ্যে অবগাহন করার মানে ঈশ্বরের সাথে মিশে যাওয়া। ঈশ্বরকে পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হরিনাম করা। তাঁর হরিনাম সংকীর্তনের এই সাধন-ভজনের পথ বা মতবাদের নাম ‘মতুয়াবাদ’। আর তাঁর অনুসারীদের বলা হয় ‘মতুয়া’। এর অর্থ যারা হরিপ্রেমে মত্ত থাকে। মতুয়াবাদের মূল কথা হচ্ছে মনুষ্যত্ব অর্জন, আত্মোন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণ সাধন। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা— এই তিনটি স্তম্ভের ওপর মতুয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত।

হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজের পিছিয়ে পড়া, নিপীড়িত মানুষের জন্য আজীবন কাজ করেছেন। কৃষকদের প্রতি

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমার জোনাসুর নীলকুঠি অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁকে গ্রামে গ্রামে জিনিসপত্র ফেরি করা থেকে শুরু করে চাষাবাদ— সবই করতে হয়েছে। তিনি গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসা-বাগিজের প্রসার এবং উন্নততর পদ্ধতিতে অনাবাদী জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। তিনি অনগ্রসর, নিষ্পেষিত মানুষের আত্মশক্তিকে জাগানোর ওপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। চেয়েছেন, শত শতাব্দীর বিধিনিষেধ আর অত্যাচারের অবসান। তিনি সবাইকে কাজ করতে বলেছেন। সন্ন্যাসধর্মে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। বরং সংসারের দায়িত্ব পালনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি নিজেও শান্তিবালা দেবীকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। জাতির উন্নতির জন্য সকলের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোড় দিয়েছেন। তিনি স্বল্পকালীন জীবদ্দশায় তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষার প্রসারে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে নির্দেশ দিয়ে যান। হরিচাঁদ ঠাকুর সংঘবদ্ধতার ওপর জোর দেন। মতুয়াবাদীরা তাই তৈরি করেছেন, মতুয়া মহাসংঘ।

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের বারোটি উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলো ‘দ্বাদশ আজ্ঞা’ নামে পরিচিত।

১. সদা সত্য কথা বলবে।
২. পিতা-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।
৩. নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে।
৪. জগৎকে প্রেম করবে।
৫. সকল ধর্মের প্রতি উদার থাকবে।
৬. জাতিভেদ করবে না।
৭. হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে।
৮. প্রতিদিন প্রার্থনা করবে।
৯. ঈশ্বরে আত্মদান করবে।
১০. বহিরঞ্জে সাধু সাজবে না।
১১. ষড়রিপুকে বশে রাখবে।
১২. হাতে কাম, মুখে নাম করবে।



মতুয়াবাদের ত্রিকোণ লাল রঙের পতাকার তিনদিকে সাদা প্রান্তরেখা। লাল রং বিপ্লবের প্রতীক এবং সাদা শান্তির প্রতীক। সম-অধিকারের ভিত্তিতে সমাজের সকলের সহাবস্থানের শান্তিময় পরিবেশ তৈরির জন্য বিপ্লব। মতুয়ারা সংঘবদ্ধভাবে নিশান উড়িয়ে, জয়ডঙ্কা, কাঁসর, শিঙা বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন ও নৃত্য করে।

মতুয়াবাদে পিতামাতাই হলেন প্রধান ঈশ্বর। তাঁরাই সৃষ্টিকর্তা। তাঁরা সন্তানকে লালন-পালন করে মানুষ করে তোলেন। সন্তানেরও প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো পিতামাতার সেবা করা, তাঁদের দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগের আশু সমাধান করা।

সমস্ত মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই মতুয়াধর্মের মূল উদ্দেশ্য। নারীর প্রতি সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধেও হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর মত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নারীকে অবজ্ঞা করে আদর্শ গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নারী গৃহের কেন্দ্রস্থল। নারীকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মপথে অগ্রসর হতে হয়। এজন্যই তিনি নারীশিক্ষা, নারীর মর্যাদা দান ও অধিকার রক্ষার জন্য সবাইকে নির্দেশ দেন।

- হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা থেকে শিক্ষার্থীদের এমন তিনটি আজ্ঞা বেছে নিতে বলুন যেগুলো সে পালন করতে পারবে বলে মনে করে। তারপর বলুন পাঠ্যবইয়ের ‘আজ্ঞাপালন’ হকে আজ্ঞাগুলো এবং সেগুলোর মানে বুঝিয়ে লিখতে।

১৮৭৮ সালের ৬ মার্চ হরিচাঁদ ঠাকুর ইহলীলা সংবরণ করেন। ঠাকুরের জীবন ও আদর্শ নিয়ে হরিভক্ত কবিরাজ তারকচন্দ্র সরকার রচনা করেন ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’ গ্রন্থ। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে মানেন। তাঁরা বলেন—

রাম হরি কৃষ্ণ হরি হরি গোরাচাঁদ।

সর্ব হরি মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ।।

ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁর ছেলে গুরুচরণ ‘গুরুচাঁদ’ নামে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে পূজিত হন। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মতুয়া সম্প্রদায়ের হরিমন্দির আছে। সেসব মন্দিরে ভক্তগণ নিয়মিত নামকীর্তন করেন, হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে আছে প্রধান হরিমন্দির। সেখানেই মতুয়া সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র। প্রতিবছর চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে অর্থাৎ হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথিতে ওড়াকান্দিতে মহাবারুণী স্নান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনদিন পর্যন্ত বারুণী মেলা বসে। এই স্নান ও মেলায় বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত ও পর্যটকের সমাবেশ ঘটে।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, হরিচাঁদ ঠাকুর যেমন সমাজের নানান সমস্যা অনুভব করে তার সমাধানের পথও দিয়েছিলেন। তাঁর কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীও যেন সমাজের দুটো সমস্যা খুঁজে পাঠ্যবইয়ের ‘সমাজকর্ম’ হকে সমাধানের পথ লেখে।

## মা আনন্দময়ী

১৮৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া (তৎকালীন ত্রিপুরা) জেলার খেওড়া গ্রামের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। একসময় আকাশ জুড়ে দেখা দিল আলোকছটা। এমন একটা সময় বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের পত্নী মোক্ষদা সুন্দরীর কোল আলো করে জন্ম নিলেন শিশুকন্যা নির্মলা। এই নির্মলা একদিন ‘মা আনন্দময়ী’ নামে সারা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ আলো ছড়ান।

পাঁচ বছরের নির্মলা একদিন বাবার কাছে জানতে চান, হরি নাম করলে কী হয়? বাবা বিপিনবিহারী বলেন, হরির নাম করলে হরিকে দেখা যায়, মা। মেয়ে আবার প্রশ্ন করে, হরি কি খুব বড়, বাবা? বাবা বলেন, হ্যাঁ গো, হরি যে খুব বড়। ছোট নির্মলা বুঝে উঠতে পারে না, এই ‘খুব বড়’টা কত বড়! শেষ পর্যন্ত সামনের মাঠটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এই মাঠের মতো বড়? হেসে ফেলেন বিপিনবিহারী। বলেন, এর চেয়ে অনেক অনেক বড়। তুই তাকে ডাকলেই জানতে পারবি তিনি কত বড়! বাবার কথা শুনে ছোট মেয়েটি মনপ্রাণে হরিকে ডাকতে থাকেন। হরিনাম কীর্তন তাঁকে আনন্দ দিল।

গ্রামের পাঠশালায় নির্মলার পড়াশোনা শুরু হলেও তা বেশিদূর এগোয়নি। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে। রমণীমোহনকে তিনি ডাকতেন ‘ভোলানাথ’ নামে। পরে তিনি ওই নামেই পরিচিত হয়েছিলেন। ভোলানাথ রাজিতপুরে চাকরি করতেন। বিয়ের প্রায় দশ বছর পর নির্মলা স্বামীর কর্মস্থলে যান। সেখানে তাঁর মধ্যে ক্রমশই দিব্যভাব প্রকাশিত হতে থাকে। কোথাও কৃষ্ণনাম শুনলে তিনি আকুল হয়ে যান। একবার ভূদেবচন্দ্র বসুর বাড়িতে কীর্তন শুনতে শুনতে নির্মলা অজ্ঞান হয়ে যান। তখন তাঁর দেহ থেকে দিব্য আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এভাবে নির্মলার মধ্যে মহাভাবের শুরু হয়। আনন্দময়ী মায়ের পুরো জীবন জুড়ে রয়েছে নানারকম অলৌকিক ঘটনার জনশ্রুতি।

১৯২৪ সালে ভোলানাথ নবাবের বাগানে চাকরি নিয়ে ঢাকার শাহবাগে চলে আসেন। সঙ্গে আসেন নির্মলাও। এই শাহবাগের কালী মন্দিরে নির্মলার মধ্যে মাতৃমূর্তি প্রকটিত হয়। নির্মলা নিজের যোগ-বিভূতির ঐশ্বর্যে হয়ে উঠলেন ‘মা আনন্দময়ী’। এখানেই তাঁর সাধন-ভজন চলতে থাকে। ১৯২৬ সালে সিদ্ধেশ্বরীতে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আনন্দময়ী মায়ের আদি আশ্রম এটি।

ঢাকার নবাবের মেয়ে প্যারীবানু মাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ১৯২৭ সালে তিনি নিজের পুত্র ও কন্যার বিয়েতে মা আনন্দময়ীকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানান। তিনি বিয়েতে আসেন। প্যারীবানুর বাড়িতে মায়ের কণ্ঠে কীর্তন শুনতে এসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তীদেবী। আনন্দময়ী মায়ের সর্বাঙ্গে এক দিব্য-ভাব, মুখ-মণ্ডলে এক স্বর্গীয় সুষমা। বাসন্তীদেবী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মা আনন্দময়ীর দিকে— আর কোনোদিকেই তাঁর লক্ষ নেই। পরে এর কারণ জানা গেল; চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আনন্দময়ী মাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। স্বপ্নে মা তাকে জানিয়েছিলেন, বাসন্তীদেবীর ভয়ানক বিপদ আসছে। অথচ তখন অবধি তিনি মাকে চিনতেন না!

১৯৩২ সালে মা আনন্দময়ী স্বামীসহ চলে যান উত্তর ভারতের দেৱাদুনে। দিব্যভাবের পরিচয় পেয়ে সেখানকার অনেকেই তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। অনেক নগর, জনপদ, তীর্থ ভ্রমণ করে, অনেক মানুষকে কৃপা করে মা আনন্দময়ী আসেন হরিদ্বারে। দেৱাদুনে যাওয়ার বছর পাঁচেক পরে, সেবার কুম্ভমেলায় যোগস্নানে ভক্তদের নিয়ে মা এসেছেন। উঠেছেন ভক্ত ডা. পীতাম্বর পন্থর বাড়িতে। গজাতিরে ডা. পন্থের বাড়িটাকেই মা ‘আনন্দময়ী সেবাশ্রম’ করে গড়ে তুলেছেন। এখানে আসবার দু’একদিন পরেই মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকেরা মায়ের

ক্যাম্পার হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ফলে সকলেই উদ্ভিগ্ন, দিশাহারা। সবাই ধরে নিলেন, মাকে এবার আর বাঁচানো যাবে না। একদিন মা ভক্ত অভয়কে নামকীর্তন করার নির্দেশ দিলেন। কীর্তনানন্দে সবাই ভেসে গেলেন, সেইসঙ্গে ভেসে গেল মায়ের রোগ-ব্যাধিও।

মা আনন্দময়ীর কাছে জগৎ নৃত্যময়। মাটিতে একটি বীজের যখন অঙ্কুরোদগম হয়, সেটা কিন্তু তখন নৃত্যের ভঙ্গিমায় বেড়ে ওঠে। গাছটি বেড়ে উঠতে উঠতে একটা সময় সেই মাটিতেই মিলিয়ে যায়। তাই তিনি বলছেন, এই তরঙ্গরূপ নৃত্য যা থেকে শুরু হয়, একসময়ে স্তিমিত হয়ে আবার তাতেই মিলে যায়। তাঁর এই ভাব মূলত জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্পর্কেরই রূপ। তাঁর মতে, ভগবানের খেলা, লীলা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সবই নৃত্যরূপে প্রকাশ। নৃত্যশিল্পী পণ্ডিত উদয়শঙ্করও নৃত্য সম্পর্কে মায়ের বিশ্লেষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মা আনন্দময়ী বলতেন, “সংসারটা ভগবানের; যে যেই অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা থেকে কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া মানুষের কর্তব্য।” এটাই মায়ের মুখ্য বাণী।

মা আনন্দময়ীর আরও কিছু বাণী

- ভেতরে যেমন অজ্ঞানের পরদা আছে, জ্ঞানের দরজাও আছে।
- পাথর দেখলে বিগ্রহ নেই আর বিগ্রহ দেখলে পাথর নেই।
- যিনি অখণ্ডরূপে প্রভু তিনিই খণ্ডরূপে দাস।
- ভগবানের রাজ্যে প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার যোগ, নিত্যযোগ।
- কর্ম করে কে? কর্মও তিনি করছেন, ফলও তিনি ভোগ করছেন।

মা আনন্দময়ী ভারতবর্ষের জনগণকে ভগবদ্ব্যুৎসাহী করার কাজে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি পুরো উপ-মহাদেশে অনেকবার ভ্রমণ করেছেন। তিনি অন্যান্য দেশেও গিয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মস্থল, সহস্র ঋষির তপোভূমি নৈমিষারণ্যকে তিনি জাগরিত করেন। এখন সেখানে কীর্তন, নাচ, গান, ধর্মগ্রন্থপাঠ, সংসঙ্গ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চলছে। এভাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের স্নান হয়ে ওঠা এবং হারিয়ে যাওয়া ধর্মস্থানকে জাগ্রত করেছেন। সেখানে যাগ-যজ্ঞ, মন্দির, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সনাতন ধর্মের ভাবধারায় একাত্ম করেছেন। বাংলাদেশের রমনা ও খেওড়ার দুটি আশ্রমসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামে প্রায় পঁচিশটি আশ্রম, বিদ্যাপীঠ, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মা আনন্দময়ীর সান্নিধ্যে এসেছেন দেশের অতি সাধারণ নগণ্য গ্রামবাসী থেকে শুরু করে ভারতের অনেক জ্ঞানী-গুণী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ঐরা মায়ের সঙ্গে দেখাও করেছেন। তাঁর দেখা হয়েছে মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রোমেন রোল্যান্ডের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে। তিনি পরমহংস যোগানন্দ, রমণা মহর্ষি, স্বামী শিবানন্দ এবং মাদার তেরেসার মতো অন্যান্য আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

মা আনন্দময়ী কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই তাঁর স্নেহের পাত্র ছিল। তিনি সর্বজনীন প্রেম ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর সবকিছুর মধ্যে বিরাজমান। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হলো নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা। তিনি মানুষকে ধ্যান, প্রা-



র্থনা, সেবা এবং আত্মানুসন্ধান করতে বলতেন। আনন্দময়ী স্বামী ভোলানাথ ছাড়া কাউকে দীক্ষা দেননি এবং নিজেও কারোর কাছে দীক্ষিত হননি। মা আনন্দময়ী সমাধিস্থ হয়ে বহু মন্ত্র বীজসমেত উচ্চারণ করতেন। সেই সমস্ত মন্ত্র লিখে রাখতেন ভোলানাথ। মা বলতেন, যখন কেউ দীক্ষা নিতে আসবে, তখন এই মন্ত্রই তাদের দেবে। তবে তিনি বলতেন, স্থূলভাবে দীক্ষার প্রয়োজন, সকলের জন্য সব না।

মা আনন্দময়ী ১৯৮২ সালের ২৭ আগস্ট দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে, নিজের বিদায়ক্ষণটি তিনি নিজেই স্থির করেন। তার সমাধি মন্দিরের অবস্থান উত্তর ভারতের হরিদ্বারে কনখল আশ্রমে গঙ্গার তীরে। প্রতি বছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সেখানে যান। মায়ের শিক্ষা এবং উত্তরাধিকার, বিশ্বজুড়ে যারা জীবনে শান্তি, আনন্দ এবং জ্ঞানের সন্ধান করে তাদের অনুপ্রাণিত করে।

- শিক্ষার্থীদের মা আনন্দময়ীর কিছু বাণী খুঁজে বের করে পড়তে বলুন। তারপর তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সেগুলো নিয়ে আলাপ করে কার কোন বাণীটি ভালো লেগেছে, কেন ভালো লেগেছে তা পাঠ্যবইয়ের ‘প্রিয় বাণী’ ছকে লিখে আনতে।

### শ্রীলভক্তিবদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

১৮৯৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর, কোলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় মামার বাড়িতে জন্ম নেয় এক শিশু। মামা শিশুটির নাম রাখেন নন্দদুলাল। নন্দদুলালের বাবা গৌরমোহন দে আর মা রজনী দেবী। ঐরা শিশুটির নাম রাখেন অভয়চরণ। তাঁদের বসবাস কোলকাতার হ্যারিসন রোডে। অনেক পরে শিশুটির পুরো নাম হয়েছিল কৃষ্ণকৃপাপ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ শ্রীলভক্তিবদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘ইন্টার-ন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেন্স (ইস্কন)’, বাংলায় যাকে বলে ‘আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ’। তিনি ভক্তিয়োগের শিক্ষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শৈশবে অভয়চরণ সম্পর্কে জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, “শিশুটির বয়স যখন ৭০ বছর হবে, তখন তিনি সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাবেন, এক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকরূপে স্বীকৃতি লাভ করবেন এবং ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।” এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় সবটাই তাঁর জীবনে সত্যে পরিণত হয়েছিল। কোলকাতার ছেলে অভয়চরণ কেমন করে সারাবিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিলেন সে কাহিনি গল্পকেও হার মানায়।

গৌরমোহন দে ছিলেন একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব। তাঁর ইচ্ছে ছেলে অভয়চরণও তাঁর মতন বৈষ্ণব হোক। এজন্য তিনি ছেলেকে নিয়মিত রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে নিয়ে যেতেন। অভয়চরণের মা ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা। তাই তাঁর মধ্যেও বৈষ্ণব ভাবের প্রকাশ ঘটেছিল। অভয়চরণ শৈশব থেকেই দেখতেন, মা কেমন সারল্যভরে সকলের মঞ্জলের জন্য প্রার্থনা করেন, পূজা-পার্বণ করেন— এই ভক্তি ও সারল্য বালক অভয়চরণের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

অভয় যতই বড় হচ্ছিলেন, ততই ভগবানের বিগ্রহের প্রতি ভক্তি বাড়ছিল। পাঁচ বছরের ছোট্ট অভয়কে বাবা তিন ফুট উঁচু একটা রথ বানিয়ে দেন। এরপর অভয়ের অনুরোধে, বাবা তাঁকে নিজস্ব রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ কিনে দেন।



তখন থেকে নিজের খাবার আগে তিনি রাধা-গোবিন্দকে নিবেদন করতেন, তারপর প্রসাদ গ্রহণ করতেন। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকেই অভয় প্রতিদিন ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সেই বিগ্রহের আরতি করতেন।

কলেজে পড়বার সময়ে, বাইশ বছর বয়সে অভয়চরণের বিয়ে হয় রাধারাণী দত্তের সঙ্গে। তখন তিনি কোল-কাতার স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রের স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছিল। তাঁরই কলেজে এক ক্লাস ওপরে পড়তেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা অভয়চরণকে মুগ্ধ করে।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের প্রতিও অভয়চরণের আকর্ষণ ছিল। গান্ধীর চিন্তাজগৎ পুরোনো ভারতীয় সংস্কৃতির মূলনীতি-প্রভাবিত ছিল। তাঁর কথায় ছিল গীতার স্পষ্ট প্রভাব। অভয়চরণ গান্ধীর বক্তৃতা-বিবৃতি শুনতে এবং পাঠ করতে ভালোবাসতেন। ১৯২০ সালে অভয়চরণ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময়ে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে শতশত নিরস্ত-নিরীহ মানুষকে ইংরেজ সৈন্যরা হত্যা করে। তখন গান্ধীজী সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ইংরেজদের সবকিছু বর্জনের জন্যে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সারা দিয়ে অভয়চরণ তাঁর স্নাতক ডিগ্রি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর বাবা তখন ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠেন। তিনি বন্ধু কার্তিক চন্দ্র বসুর বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানিতে ছেলের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন। অভয়চরণের চাকরিজীবন শুরু হয় বোস ল্যাবরেটরির ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে।

১৯২২ সালে অভয়চরণ বন্ধু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুরোধে কোলকাতার বাগবাজারের গোড়ীয় মঠে যান; এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে। সন্ন্যাসীর নাম শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী। সেদিন সন্ন্যাসী তাঁদের বললেন, “তোমরা শিক্ষিত যুবক। তোমরা কেন সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছ না?” অভয় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, “আমরা একটি পরনির্ভর দেশের অধিবাসী, প্রথমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন হতে হবে। তা নাহলে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আপনি কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার করবেন?” সন্ন্যাসী উত্তর দিয়েছিলেন, “কৃষ্ণভাবনামৃত ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে না।” যুবক অভয় সেই রাতেই শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। গুরু তাঁকে বলেন, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নামকীর্তন সহজেই সকল শ্রেণির মানুষকে কাছে টানতে পারে। সংসারের সকল রকম দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে শান্তি দিতে পারে। কলিযুগে জীবোদ্ধারের এটাই একমাত্র পথ।

শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গোড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অভয়চরণ এগারো বছর ধরে গুরুর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯৩২ সালে অভয়চরণ চাকরিসূত্রে সপরিবারে এলাহাবাদ চলে যান। সেখানে তিনি চাকরির পাশাপাশি ব্যবসাও শুরু করেন। এর পরের বছর তিনি শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। গুরু তাঁকে বারবার বলেছেন, ইংরেজির ওপরে জোর দাও। অনুবাদে মন দাও, বই ছাপাও। ইংরেজি বই ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তিনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত বা চৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে গুরুর দেহত্যাগের এক মাস আগে, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে গুরুরদেবের কাছে জানতে চেয়ে, অভয়চরণ একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির উত্তরে গুরু অভয়চরণকে বলেছিলেন, আমি স্থির নিশ্চিত যে, যারা বাংলা ও হিন্দি ভাষা জানে না, সেইসব মানুষের কাছে তুমি ইংরেজিতে আমাদের চিন্তা ও যুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে। আশা করছি তুমি নিজেকে একজন সুদক্ষ ইংরেজি ধর্ম প্রচারকে পরিণত করবে। এই কথার ভিত্তিতে অভয়চরণ নতুন করে কাজে নামেন। দুই-তিন বছরের মধ্যে অভয়চরণ বই লিখলেন ‘ইনট্রোডাকশন টু গীতোপনিষদ’।

১৯৪৪ সালে অভয়চরণ ইংরেজি সাময়িকী ‘ব্যাক টু গডহেড’ প্রকাশনা শুরু করেন। তিনি নিজেই এটা সম্পাদনা করতেন, পাণ্ডুলিপি লিখতেন, পুফ যাচাই করতেন। এমনকি প্রতিটা কপি নিজেই বিতরণ করতেন। পত্রিকা-টি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভক্তির সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়। সেসময়ে অভয়চরণ তাঁর পত্রিকায় গান্ধী-জিন্মাহ সাক্ষাৎকার নিবন্ধটিতে লিখেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ স্বার্থপরতা এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনার দ্বারা প্রভাবিত থাকবে, ততদিন সাম্প্রদায়িক লড়াই চলবেই। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা এবং পারমার্থিক উপলব্ধির ভিত্তিতেই কেবল প্রকৃত ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব। সেবছরই তাঁর দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ’ তাঁকে ‘ভক্তিবাদান্ত’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫০ সালে অভয়চরণ সংসার জীবন থেকে অবসর নিয়ে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি লেখা ও পড়ার কাজে আরও বেশি করে নিবেদিত হলেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্র, বিশেষ করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রী-মদ্ভাগবতের ভাষ্যসহ অনেক বই লিখেছেন। তিনি নিজের পত্রিকা এবং বই তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত মনীষীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে তিনি দেখাও করেছেন। এঁরা তাঁর কাজের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

১৯৫৩ সালে তিনি ঝাঁসীতে নিজের প্রথম শিষ্যকে দীক্ষিত করেন। সেখানে তাঁর নিজস্ব কেন্দ্র ও ভক্তসংঘেরও শুভ উদ্বোধন হয়। কিন্তু থাকার জায়গা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে তিনি ঝাঁসী ত্যাগ করেন। তবে বি-শ্বব্যাপী ভক্ত সংঘ গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি ত্যাগ করেননি। ১৯৫৪ সালে অভয়চরণ পরিবার পরিত্যাগ করে গুরুমহারাজের আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। এরপরে তাঁকে বিভিন্ন আশ্রয়ে নানারকম কষ্টভোগ করে দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁর কাছে অর্থ ছিল না, বন্ধু-পরিবার ছিল না, তিনি ছিলেন একেবারে একা; জাগতিকভাবে ব্যর্থ একজন মানুষ। তবুও তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর গুরুমহারাজের স্বপ্নপূরণ। ১৯৫৬ সালে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে চলে যান এবং জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বিশদ প্রস্তুতি ও অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর নাম হয় ‘অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত স্বামী’।

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত স্বামী ১৯৬৫ সালে প্রায় ৭০ বছর বয়সে জাহাজে চড়ে একা আমেরিকা যান। তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য জাহাজঘাটায় কেউ ছিল না। অচেনা নতুন দেশেও তাঁর অপেক্ষায় কেউ ছিল না। জাহাজ থেকে নেমে ডানে না বাঁয়ে যাবেন তাও জানতেন না। তাঁর সম্বল ছিল কেবল আটটি ডলার, কিছু শুকনো খাবার আর নিজের লেখা বেশকিছু বই। অথচ অনেক ঝড়-ঝাপটা পেরিয়েও প্রবল মনের জোড় আর অটল বিশ্বাসে তিনি সেখানে টিকে রইলেন। প্রচার করলেন কৃষ্ণনাম। ক্রমশ তাঁর খ্যাতি আমেরিকা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকায় পৌঁছানোর এক বছর পরে তিনি নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠা করেন ‘আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ-ভাবনামৃত সংঘ’ সংক্ষেপে যা ‘ইস্কন’ নামে পরিচিত। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে এমন অনেক আমেরিকান যুবক-যুবতীকে আকৃষ্ট করেছিলেন যারা বস্তুবাদী সংস্কৃতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে জীবনের আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজছিলেন। তিনি তাদের ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।’— এই মহামন্ত্র জপ করতে এবং শুদ্ধ জীবন যাপন করতে শিখিয়েছিলেন। তখন তিনি পরিচিত হন ‘শ্রীলভক্তিবাদান্ত স্বামী প্রভুপাদ’ নামে। তাঁর কাছে কবি অ্যালেন গিনসবার্গও এসেছিলেন; ভক্তদের নিয়ে পথে পথে গেয়েছিলেন ‘হরেকৃষ্ণ’ মহানাম।

স্বামী প্রভুপাদ বিশ্বাস করতেন, সকল জাতির মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে পারলে কোনো জাতিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ থেমে যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি মন্দির,

আশ্রম, পল্লী-আশ্রম, বিদ্যালয়, রেস্তোরাঁ এবং প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি চৌদ্দবার বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেন। অনেক বিশিষ্ট নেতা, পণ্ডিত এবং বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন। বিটলস্ তারকা জর্জ হ্যারিসনসহ বহু স্নানামধ্য ব্যক্তি তার আদর্শের অনুসারী হন। শতাধিক মন্দির, আশ্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কৃষকেন্দ্রের সমন্বয়ে ইসকনকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বর্তমান বিশ্বের অন্তত একশটি দেশে ইসকনের সাতশরও বেশি মন্দির আছে। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মায়াপুরে ইসকনের প্রধান মন্দিরের অবস্থান। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি জেলা শহরে ইসকনের মন্দির আছে।

শ্রীল প্রভুপাদের লেখা বইগুলো যেমন জ্ঞানীর পাঠ্য তেমনি সাধারণ মানুষেরও। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেগুলো পাঠ্য। বৈদিক দর্শনের এইসমস্ত বই প্রকাশ করছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা ‘ভক্তিবৈদান্ত বুক ট্রাস্ট’। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চারটি খণ্ড তাৎপর্যসহ ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। শ্রীমত্তাগবতের ভাষ্যসহ আঠারো হাজার শ্লোকের ইংরেজি অনুবাদও করেন, যা আঠারোটি খণ্ডে প্রকাশিত। বৈদিক সংস্কৃতি ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে সত্তরটিরও বেশি বই অনুবাদ করেছেন ও লিখেছেন। এই বইগুলো আশিটির বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন হয়। আজ পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা হাজারেরও বেশি।

১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহলীলা সংবরণ করেন। সেখানকার কৃষ্ণবলরাম মন্দিরে তিনি সমাধিস্থ আছেন।

- শিক্ষার্থীদের বলুন ‘জীবন-সাধনা’ ঘরে স্বামী প্রভুপাদ-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি ঘটনার ছবি আঁকতে এবং ছবির নিচে ক্যাপশন লিখতে।

### সাধক রামপ্রসাদ

আঠারো শতকের বাঙালি গীতিকবি রামপ্রসাদ সেন। যাঁর গান পরবর্তী সময়ে কমলাকান্ত, লালন, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত— সকলকেই প্রভাবিত করেছে। তিনি ছিলেন মাতৃসাধক। তাই তাঁকে আমরা সাধক রামপ্রসাদ বলেই চিনি। মা কালীর প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, ভরসা, অভিমানে তিনি কালীকে নিজের মা, মেয়ে, বন্ধু এবং গুরু হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি শ্যামাসংগীতের মাধ্যমে কালীর সাথে আবেগ, হাস্যরস, বিদ্রুপ এবং প্রজ্ঞায় পূর্ণ এক গভীর সম্পর্ক প্রকাশ করেছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ মা কালীকে ব্রহ্মজ্ঞানে আরাধনা করতেন। আবার একইসঙ্গে নিজের ঘরের মেয়ে বলেও ভাবতেন। গানে গানে সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন—

আমার অন্তরে আনন্দময়ী

সদা করিতেছেন কেলি,

আমি যেভাবে-সেভাবে থাকি

নামটি কভু নাহি ভুলি।

আনুমানিক ১৭২০ সালে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরে হালিশহর গ্রামের সর্বেশ্বরী দেবীর কোলে আসেন রামপ্রসাদ

সেন। তাঁর বাবা রামরাম সেন। তিনি ছিলেন আয়ুর্বেদিক ঔষধ ব্যবসায়ী। রামপ্রসাদের লেখা আত্মপরিচয় থেকে বোঝা যায়, রামরাম সেনেরও কাব্য-প্রতিভা ছিল। রামপ্রসাদ শৈশব থেকেই নিজের মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। পাঠশালার পাঠ শেষ করে পারিবারিক ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখেন। কিন্তু ব্যবসার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। সাহিত্য ও সংগীত তাঁকে প্রবলভাবে টানত। তাই রামরাম সেন ছেলেকে সাহিত্য-সমৃদ্ধ ভাষা ফারসি শেখানোর ব্যবস্থা করেন। এভাবে রামপ্রসাদ ষোলো বছর বয়সের মধ্যেই সংস্কৃত, বাংলা, ফারসি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁর সাহিত্য ও সংগীতচর্চার পথ প্রসারিত হয়। এ বয়সেই তাঁর মধ্যকার অসাধারণ কবিত্ব শক্তি প্রকাশিত হয়।

সংসারের প্রতি তাঁর একেবারেই মন ছিল না। এই দেখে বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই সমস্যার সমাধান হিসেবে তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হলো। কনে ছিলেন শর্বাণী দেবী। কিন্তু বিয়ের পরও সংসারের প্রতি রামপ্রসাদের কোনো আগ্রহ তৈরি হলো না। বরং মাতৃসাধনায় মনোযোগ আরও বাড়ল। বয়স তখন সতেরো কী আঠারো, এমন সময়ে রামপ্রসাদের জীবনে নেমে এল ঘোরতর দুর্যোগ; বাবা রামরাম সেন মারা গেলেন। ফলে সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপরে এসে পড়ে। তাই অর্থ উপার্জনের জন্য রামপ্রসাদকে কলকাতায় যেতে হয়।

কলকাতার ম্যানহাটের জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র। রামপ্রসাদ তাঁর সেরেস্ভায় মুহুরির পদে কাজ নেন। মুহুরির কাজ খাতায় হিসাব লিখে রাখা। কিন্তু কালীভক্ত রামপ্রসাদ হিসাবের খাতা শ্যামাসংগীত লিখে ভরে ফেললেন। জমিদারের কানে খবর গেল। তিনি খাতাসহ রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন। রামপ্রসাদের মনে ভয়, চাকরি বুঝি আর থাকে না! কিন্তু ঘটনা ঘটল উল্টোরকম। জমিদারবাবু রামপ্রসাদের রচনা পড়ে মুগ্ধ হলেন। বললেন, হিসাব করার জন্য তোমার জন্ম হয়নি। আরো বড় কাজের জন্য তোমার জন্ম। বাড়ি ফিরে যাও, মায়ের সাধনা করো আর শ্যামাসংগীত রচনা করো। রামপ্রসাদের বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। দুর্গাচরণ এই টাকাটা রামপ্রসাদের মাসিক বৃত্তি হিসেবে বরাদ্দ করলেন। রামপ্রসাদ ফিরে এলেন নিজ গ্রাম হালিশহরে। জমিদারের বরাদ্দের টাকায় সংসার কোনোমতে চলছিল। আর রামপ্রসাদ একমনে মায়ের ভজনা আর সংগীতের সাধনা করে চললেন।

রামপ্রসাদ গঞ্জার ঘাটে বসে আপন মনে স্বরচিত গান গাইতেন। তাঁর সুমধুর গান শুনে নৌকার মাঝিদের দাঁড় থেমে যেত। যাত্রীরা যাত্রা থামিয়ে ভক্তিভরে রামপ্রসাদী গান শুনতেন। কথিত আছে, একদিন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাও গঞ্জার ওপর দিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় যাবার সময়ে রামপ্রসাদের গান শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বজরায় ডেকে এনে মন ভরে গান শোনেন।

ঘীরে ঘীরে সাধক রামপ্রসাদের মাতৃসাধনা ও শ্যামাসংগীতের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন নবদ্বীপের রাজা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি রামপ্রসাদের খ্যাতির কথা শুনে তাঁকে রাজসভায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু সাধক রামপ্রসাদ, যিনি গানে গানে কালী মাকে জানিয়েছেন, “চাই না মাগো রাজা হতে—”; তিনি মহা-রাজার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তবুও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সাধনা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। মহারাজের অনুরোধে রামপ্রসাদ রচনা করেন ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি এই কাব্য পড়ে মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রস্তাবে মহারাজ রামপ্রসাদকে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

- শিক্ষার্থীদের বলুন কয়েকটি রামপ্রসাদী গান শোনার চেষ্টা করতে (শ্রেণিকক্ষেও শোনার ব্যবস্থা করতে পারেন), শিক্ষার্থীর পছন্দের গানটি ‘রামপ্রসাদী গান’ ছকে লিখে রাখতে।

রামপ্রসাদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল শ্যামা মা। সারাক্ষণ কেবল মায়ের কথাই ভাবতেন। তিনি কাজ করতে করতেও মুখে শ্যামা মায়ের নাম নিতেন। কন্যারূপে মা কালী রামপ্রসাদের কাছে ধরা দিয়েছিলেন— এরকম অলৌকিক ঘটনাও প্রচলিত আছে। ঘটনাটি হলো, একদিন রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বাঁধছিলেন। বেড়ার উল্টোদিক থেকে মেয়ে জগদীশ্বরী বেড়া বাঁধবার দড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে বাবাকে সাহায্য করছিল। এক সময়ে ছোট্ট মেয়ে জগদীশ্বরী বাবাকে কিছু না বলে খেলতে চলে যায়। তখন মা শ্যামা জগদীশ্বরীর রূপ ধরে এসে রামপ্রসাদকে কাজে সাহায্য করেন। অনেকক্ষণ পরে জগদীশ্বরী এসে দেখে বাবার বেড়া বাঁধা হয়ে গেছে। তার কথায় বাবা রামপ্রসাদ জানলেন, মেয়ে এতক্ষণ এখানে ছিল না। তখন রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, শ্যামা মা-ই জগদীশ্বরী-রূপে এসেছিলেন। রামপ্রসাদ তখন আকুল হয়ে ‘মা মা’ বলে ডাকতে লাগলেন। ভক্তিভাবে তাঁর দুচোখ বেয়ে জলধারা নামল। এরপর রামপ্রসাদের সাধনা আরও গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। রাতদিন শুধু মা-ই ধ্যান-জ্ঞান। এই একনিষ্ঠ সাধনায় তুষ্ট হয়ে একদিন মা নিজরূপে দেখা দিলেন। চারদিক আলোকিত করে তিনি রামপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সাধক রামপ্রসাদ মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলেন। সিদ্ধ হলো তাঁর সাধনা। এরপর তিনি প্রায়শঃই ভাব-সমাধিস্থ হতেন এবং মা কালীর দর্শন লাভ করতেন। রামপ্রসাদের আশীর্বাদে অলৌকিকভাবে বহু মানুষ রোগমুক্ত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। মাতৃরূপে শক্তিসাধনার যে নতুন ধারা রামপ্রসাদ প্রবর্তন করেছেন তা-ই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা প্রমুখ সাধককে অনুপ্রাণিত করেছে।

রামপ্রসাদ রাগ ও বাউল সুরের মিশ্রণে এক ভিন্ন ধারার সুর সৃষ্টি করেন, যা ‘রামপ্রসাদী সুর’ নামে পরিচিত। বাস্তব জীবনে কর্মযোগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার এক অপূর্ব মিলনের চিত্র আমরা রামপ্রসাদের জীবন ও সংগীতে খুঁজে পাই। অন্তরে বৈরাগ্য নিয়েও রামপ্রসাদ গৃহী ছিলেন। সংসারের দায়িত্ব-কর্তব্য মাথা পেতে নিয়েছিলেন। জীবনের দুঃখ-কষ্টকে গৌরব মনে করে গানের মধ্য দিয়ে বলেছেন, ‘আমি কি দুঃখেরে ডরাই’। তাঁর রচিত গানের বেশিরভাগই হারিয়ে গিয়েছে। যা খুঁজে পাওয়া যায় তার সংখ্যাও খুব কম নয়। তাঁর কিছু জনপ্রিয় গান—মন রে কৃষি কাজ জানো না, ডুব দে রে মন কালী বলে, মা আমায় ঘুরাবি কত ইত্যাদি। দুর্গাপূজার সময়ে যে আগমনী গান শোনা যায়, সেই গানের ধারাটিরও প্রবর্তক রামপ্রসাদ। এছাড়াও রামপ্রসাদ কালী-কীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, শিবকীর্তন, সীতাবিলাপ, নৌকাখন্ডের সংগীত নামে বিভিন্ন জনপ্রিয় পালা রচনা করেছেন। রামপ্রসাদের অনেক গান আজও ভক্ত এবং সংগীতপ্রেমীদের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের ধ্রুপদী সম্পদ বলে বিবেচিত।

রামপ্রসাদের সময়ে ভারতীয় সমাজ নানা বিপর্যয় এবং পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল— ১৭৩৯-এর মহা-প্লাবন, ১৭৪২ এবং ১৭৫২ সালের বর্গী হানা, ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ আর ১৭৬৯-এর মন্ডবর। এসবের ভয়াবহ প্রভাব পড়েছিল বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর। এসব ঘটনা প্রবাহের প্রভাব রামপ্রসাদের গানে রয়েছে। ফলে এই গানগুলোর ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বও অনেক। সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন রামপ্রসাদ। সতীদাহ প্রথা রদ হওয়ার বহু আগে রামপ্রসাদ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, ‘নহে শাস্ত্রশাম্যতা সহমৃত্যু।’

আনুমানিক ১৭৮১ সালে রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুঘটনা সম্পর্কে লোককথা এই যে, কালীপূজা শেষে প্রতিমা বিসর্জনের সময় ‘তিলেক দাঁড়াওরে শমন’ গানটি গাইতে গাইতে তিনি প্রতিমার সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন।



## সারদা দেবী

উনিশ শতকের সাধিকা সারদা দেবীর মধ্যে ভক্তরা করুণা, বিশুদ্ধতা এবং প্রজ্ঞার মূর্ত রূপ দেখেছিলেন। তারা সারদা দেবীর মাতৃসুলভ গুণটি অনুভব করতে পারতেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটা গ্রামের দম্পতি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবী। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর তাঁদের এক কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। বাবা কন্যাটির নাম রাখেন ঠাকুরমণি দেবী। আর মা রাখেন ক্ষেমাঙ্গরী। পরে শিশুটির নাম হয় ‘সারদামণি’। এই সারদামণিই কালক্রমে সারদা দেবী ও শ্রীমা হিসেবে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। কথিত আছে, সারদা দেবীর জন্মের পূর্বে রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী দিব্যদর্শনে মহাশক্তিকে তাঁদের কন্যারূপে জন্ম নিতে দেখেছিলেন।

সারদা দেবীর শৈশব বেশ অনটনে কেটেছে। পিতা রামচন্দ্রের সামান্য জমির ফসল আর পৌরোহিত্যের আয় দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলত। ছোট্ট সারদামণি ঘরের কাজকর্ম করতেন। ছোট ভাইদের দেখাশোনা করতেন। গোবাদিপশুর যত্ন নেয়া থেকে শুরু করে ক্ষেতের ধান কুড়ানোর কাজও তাঁকে করতে হতো। সেকালের সাধারণ ঘরের মেয়েদের মতো সারদা দেবীও লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তবে তিনি নিজের উৎসাহে ভাইদের সঙ্গে কিছুদিন গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করেছেন। এভাবে কিছুটা পড়তে শেখা হলেও লেখা শেখা হয়নি। তবে কথক ঠাকুরদের কথা, যাত্রাপালা, কীর্তন শুনে শুনে তিনি নানা বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছিলেন। বেশকিছু পৌরাণিক আখ্যান ও শ্লোকও আত্মস্থ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে সারদা দেবী স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইয়ের মেয়ে লক্ষ্মীদেবীর কাছে কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন।

শৈশবে লক্ষ্মী ও কালীর মূর্তি গড়ে খেলার ছলে পূজা করতেন সারদা দেবী। ছোটবেলা থেকেই মহামায়ার ধ্যান করতেন। সেই সময়ে তাঁর বিবিধ দিব্যদর্শন ও অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায়।

সেকালের রীতি অনুযায়ী শৈশবেই সারদা দেবীর বিয়ে হয় গদাধরের সঙ্গে। গদাধরের বাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে। এই গদাধরই পরে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলে খ্যাত হন। বিয়ের বছর দেড়েক পরে শ্রীরামকৃষ্ণ চলে আসেন কোলকাতার দক্ষিণেশ্বরে। সারদা দেবী চলে যান নিজের বাবার বাড়িতে। প্রায় দুই বছর পর জয়রামবাটাতে তাঁদের আবার দেখা হয়। সেখানে কিছুদিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। এরপর দীর্ঘ সাত বছর পর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভূমি কামারপুকুরে যান। সারদা দেবীও সেখানে আসেন। এ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে জীবনের কর্তব্য ও ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক উপদেশ দেন। তিনি বলেন, ‘ঈশ্বর সকলেরই অতি আপনার। যে তাঁকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে, ডাকে, সে-ই তাঁর দেখা পায়। তুমি যদি ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে। তাঁর দেখা পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য।’ তখন থেকেই সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপদেশ পান। স্বামীর এই উপদেশ সারদা দেবীর হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিনি একে মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে সাধনার পথে যাত্রা শুরু করেন।

সাত মাস কামারপুকুরে কাটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। আর সারদা দেবী বাবার বাড়িতে চলে যান। তারপর দীর্ঘদিন কেটে যায়। একসময়ে সারদা দেবী শুনলেন যে তাঁর স্বামী পাগল হয়ে গেছেন। আবার শুনলেন তিনি বিরাট সাধক হয়ে উঠেছেন। স্বামীর জন্য সারদা দেবীর উদ্বেগ বাড়তে থাকে। তিনি বাবার সঙ্গে ১৮৭২ সালে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হন। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কোলকাতায় গঙ্গাস্নান উৎসব হবে। এই উৎসবকে সামনে রেখেই তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। অনেক কষ্ট করে পায়ে হেঁটে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান। পথে সারদা দেবী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। লোকশ্রুতি আছে যে, সেই সময়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা এক নারীর রূপে মা কালী দিব্যদর্শন

দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলার আশ্বাস দেন। দক্ষিণেশ্বরে আসার পর সারদা দেবীর সকল সন্দেহের অবসান ঘটে। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতই এক মহান আধ্যাত্মিক গুরু। সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেন। তিনি চেষ্টা করেতন যাতে স্বামীর সাধনায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। তিনি নিজেও রামকৃষ্ণের উপদেশ মতো কঠোর সাধনা শুরু করেন। ভক্তিতে বিশ্বাসে সাধন-ভজনে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে ওঠেন। সারদা দেবীকে সকলে খুব শ্রদ্ধা করত। এক সময়ে সকলের কাছে তাঁর নতুন পরিচয় হয় ‘শ্রীমা’ বলে। শ্রীরামকৃষ্ণও স্ত্রীকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। মনে করা হয়, সারদা দেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য। তিনি সারদা দেবীকে মন্ত্রশিক্ষা দেন। মানুষকে দীক্ষিত করে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করার শিক্ষাও প্রদান করেন।

১৮৮৬ সালের ১৫ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। শ্রীমা তখন একেবারে একা হয়ে যান। যদিও ভক্তরা সব সময় তাঁকে ঘিরে রাখত। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের দুই সপ্তাহ পর শিষ্যদের নিয়ে সারদা দেবী উত্তর ভারতে তীর্থ ভ্রমণে যান। অযোধ্যা, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ও কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন দর্শন করেন। এই বৃন্দাবনেই সারদা দেবী নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। এখান থেকে গুরুমাতা হিসেবে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়। সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের তিনি মন্ত্রদীক্ষা দেন। কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর বিধবার বেশে সারদা দেবী দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি মারা যাননি, কেবল এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

তীর্থযাত্রার শেষে সারদা দেবী কিছুদিন কামারপুকুরে একাকী অনেক দুঃখ-কষ্টে কাটান। ১৮৮৮ সালে শিষ্যরা মা সারদাকে কোলকাতায় নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে কোলকাতার বাগবাজারে তাঁর জন্য স্থায়ী বাসভবনও তৈরি করা হয়। এটি ‘মায়ের বাটী’ নামে পরিচিত হয়েছিল। প্রতিদিন অগণিত ভক্ত মায়ের দর্শন, উপদেশ ও দীক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সেখানে আসতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে মা সারদা ‘রামকৃষ্ণ আন্দোলন’ চালিয়ে নিয়ে যান। কথিত আছে, কয়েকজন শিষ্য মায়ের দর্শন লাভের পর আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনুভব করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁর সাক্ষাৎ লাভের পূর্বেই দেবী রূপে তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ স্বপ্নেও তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিল। এঁদের মধ্যে অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

সারদা দেবীর জীবন নিঃস্বার্থ সেবা, ত্যাগ ও সম্প্রীতির বড় উদাহরণ। তিনি সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সম্মান করতেন। সকলের সঙ্গে মায়ের মতো আচরণ করতেন। তিনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও ছিলেন উদারমনা। তাঁর মধ্যে কোনো ধরনের কুসংস্কার, বৈষম্যের বোধ ছিল না। জাতপাতেরও কোনো ভেদাভেদ ছিল না। একদিন বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে পাঠিয়েছেন সারদা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। একজন শিষ্য সারদা দেবীর কাছে জানতে চাইলেন, তিনি এই মেমসাহেবার সঙ্গে দেখা করবেন কি-না। উত্তরে সারদা দেবী বললেন, ‘নরেন একটি শ্বেতপদ্ম পাঠিয়েছে। তা কি আমি না নিয়ে পারি?’

স্বামী বিবেকানন্দ সারদা দেবীকে জীবন্ত দুর্গা বলে অভিহিত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁকে ‘সংঘ জননী’ বলে জানতেন। কুসংস্কার ও শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্ত ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ পুরো ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখন সারদা দেবীই ছিলেন তাঁর একমাত্র প্রেরণা। যেভাবে ভক্তরা তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন, ঠিক তেমনিভাবে সারদা দেবীও মমতাময়ী মায়ের মতো সকলের দেখাশোনা করতেন। সকলের মঙ্গল কামনা করতেন।



১৯১৯ সালের শুরুতে মা সারদা জয়রামবাটিতে থাকতে শুরু করেন। মাসকয়েক কাটানোর পর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য কোলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এরপরও বেশ কয়েকমাস অসহনীয় রোগযন্ত্রণা ভোগ করার পর ১৯২০ সালের ২১ জুলাই কোলকাতার উদ্বোধন ভবনে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে গঙ্গার তীরে তাঁর শেষকৃত্য হয়। এখানে গড়ে উঠেছে সারদা দেবীর সমাধিমন্দির।

যেসব জায়গায় তিনি থাকতেন বা পরিদর্শন করেছিলেন সেসব জায়গায় তাঁর দেহাবশেষ ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংরক্ষিত আছে। সারদা দেবীর কথা ও কাজ নিয়ে বিভিন্ন বই লেখা হয়েছে। তাঁর প্রভাব ও অনুপ্রেরণা মুক্তিকামী লক্ষ লক্ষ ভক্তকে শান্তি ও সুখ মুক্তির পথ দেখায়।

মহাসমাধির আগে সারদা দেবীর শেষ কথা সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, “শ্রী মায়ের দেহ যাইবার মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে এক ভক্ত অন্নপূর্ণা মাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ভেতরে যাইতে নিষেধ বলিয়া ঠাকুরঘরের বাইরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ পাশ ফিরিয়া মা তাকে দেখিয়া ইশারা করে নিকটে ডাকিলেন। তিনি কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেছিলেন, মা, আমাদের কী হবে? করুণাবিগলিত ক্ষীণকণ্ঠে অভয় দিয়া মা আশ্বস্ত আশ্বস্ত বলিয়াছিলেন, ভয় কী? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কী? তবে একটি কথা বলি, যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।” ভক্তদের প্রতি এই ছিল সারদা মায়ের শেষ বাণী।

### সারদা দেবীর আরও কয়েকটি উপদেশ:

- পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, পৃথিবী অবোধে সব সহিছে মানুষেরও সেই রকম চাই।
- কত সৌভাগ্য এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়।
- ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে ক’জনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সবাই, কিন্তু কী করে যে তাকে ভালো করতে হবে, তা বলতে পারে ক’জনে?
- কাজ করা চাই বইকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।
- মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য হলেও অপ্রিয় করে বলতে নেই। শেষে ওইরূপ স্বভাব হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুলজ্জা ভেঙে গেলে আর মুখে কিছু আটকায় না।

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বাইরের উৎস থেকেও সারদা দেবী উপদেশগুলো খুঁজে বের করে শিক্ষার্থীর পছন্দের দুটি উপদেশ সম্পর্কে ‘অনুসরণীয়’ ছকে লিখতে বলুন।

## রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে বলেন, “তুই আমায় কাঁধে করে যেখানেই নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব এবং থাকব।” গুরুর মৃত্যুর পর স্বামীজী তাঁর দেহাবশেষের অস্থিকলসটি গঙ্গা নদীর উপকূলে বেলুড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। সে জায়গাটি এখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র। বেলুড়ের এই মঠ ও মিশনকে সংক্ষেপে বেলুড় মঠও বলা হয়। বেলুড় মঠ একটি পুণ্যতীর্থক্ষেত্র। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, “ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থল হবে।”

সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের জীবনের শেষ দিনগুলোও এখানেই কাটিয়েছেন। তাঁরা এখানেই সমাধিস্থ আছেন। এখানে আগত অতিথিদের থাকার জন্য অতিথি-ভবন আছে। সেইসাথে প্রতিদিন আগত অতিথিদের জন্য প্রসাদ ভোজনের ব্যবস্থাও রয়েছে। কেবল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্যই নয়, সারা বিশ্বের সকল ধর্মমতের মানুষ, এমনকি ধর্মমত মানেন না, এরকম মানুষের জন্যও বেলুড় মঠের দ্বার উন্মুক্ত।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কথা জানতে গেলে দুজন মহামানব ও একজন মহীয়সী নারী কথা আগে জেনে নিতে হবে।

### শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণিদেবী।

কৈশোরের শুরুতে তিনি কোলকাতায় আসেন। তিনি রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবায়েত হন। তাঁর দিব্য সাধনলীলায় এই মন্দির হয়ে ওঠে মহাতীর্থ। ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট তাঁর দেহাবসান হয়।

তাঁর সাধনার লক্ষ্য ছিল সর্বধর্মের, সর্বমতের মিলন ও সমন্বয়। তিনি নিজে সকল ধর্মাচরণ করে মত দিয়েছিলেন, ‘যত মত তত পথ’। তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা ও ত্যাগের উপদেশ দেন। এর মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বীজ বপন করেন তিনি। তাই অঙ্কুরিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াসে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই মঠ ও মিশনের ইষ্টদেবতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ‘সর্বজীবে দয়া’ কথাটি বলেই আবার সংশোধন করে বলেছিলেন, “না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।” নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যদি কোনোদিন সুযোগ পান, তবে গুরুর এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞাই বাস্তব রূপ পেল। বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল, ‘তোর ছায়ায় যেন হাজার হাজার লোক আশ্রয় পায়’। পরবর্তীতে তাই হয়েছিল।

### সারদা দেবী

ভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন তখন তাঁর শক্তি নারীরূপে তাঁর সহগামিনী হন। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া, তেমনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদা দেবী। ১৮৫৩ সালের ২২

ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর কন্যারূপে শ্রীমা আবির্ভূত হন। ভাগ্যবান ভক্তরা শ্রীমায়ের মধ্যে যে যার ইষ্টদেবী দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী-জগদ্ধাত্রী-সীতা-রাধা-মেরির দর্শন পেতেন। শ্রীমা সারদা দেবী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি চত্রিশ বছর এই মঠ ও মিশনের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব প্রচারের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তর কোলকাতায় বিশ্বনাথ দত্ত এবং ভুবনেশ্বরী দেবীর কোলে ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান। যার নাম রাখা হয় শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। তার সুন্দর চেহারা, সংগীত-নৃত্য-বাদ্যে পারদর্শিতা, সাহস, ঔদার্য, সত্যনিষ্ঠা শৈশব থেকেই সকলকে মুগ্ধ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তারপর তাঁর নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে বলা হয় স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের অবতার।

তিনি গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সমস্ত ভোগসুখ ত্যাগ করে মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেন। পরিব্রাজক হয়ে পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে ভারতের দুঃখ-দুর্দশার কারণ অনুভব করেন। এরপর ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসভায় বক্তব্য দিয়ে উপস্থিত সকলকে অভিভূত করেন। এরপর তিনি পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের বেদান্তবাণী এবং শ্রীঠাকুরের আদর্শ ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তিনি পরলোকে গমন করেন।

## রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

### শুরুর কথা

১৮৬৮ সালের ২৭ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরাবাবুর সঙ্গে বৈদ্যনাথধাম-দেওঘরে উপস্থিত হলেন। সেখানকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুর্দশা দেখে মথুরাবাবুকে এই মানুষগুলোকে সাহায্য করবার অনুরোধ করলেন। মথুরাবাবু জানালেন, এদের সাহায্য করতে গেলে তীর্থভ্রমণের খরচে টান পড়বে। ঠাকুর তখন বললেন, “দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।” তখন মথুরাবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের সেবা করলেন। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারের বীজ সেদিনই প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন অচল শিব দর্শনের চেয়ে সচল শিব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে ‘মানুষের সেবা’ সেদিনই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর গুরুর ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গড়ে তুলবার দায়িত্ব নেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৭ সালের ১ মে স্বামীজী ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের একত্রিত করে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ও কার্যাবলি ঠিক হলো—

- সকল ধর্মকে একই সনাতন ধর্মের বিকাশ মনে করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

করা

- উন্নত চরিত্রের কর্মী তৈরি করা, যারা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে, জনসাধারণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করবে
- ভারতের (দেশের) শিল্প, সাহিত্য এবং ললিতকলার উন্নতি ও বিস্তার সাধন করা
- শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বজনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করা
- জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নরনারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করা

- শিক্ষার্থীদের ‘আমার মত’ ছকের বক্তব্যগুলোর সঙ্গে তারা সহমত কি-না জানিয়ে মতামতের ব্যাখ্যা দিতে বলুন।

এরপর ১৮৯৯ সালে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ বর্তমান বেলুড় মঠে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০১ সালে রামকৃষ্ণ মঠের রেজিস্ট্রেশন হয় আর ১৯০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের রেজিস্ট্রেশন হয়। উভয়ের প্রধান কার্যালয় এই বেলুর মঠ। রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠ হলো রামকৃষ্ণ সংঘের দুটো দিক। মিশন শিবজ্ঞানে জীবসেবা— এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জনসেবামূলক কাজ পরিচালনা করে। মঠ পূজা ও দীক্ষার আয়োজন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতবাদের প্রচার প্রসার এবং মহামানবদের শ্রদ্ধা জানানোর কাজ করে।

## রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীক

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ সাধনার এই চার পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে। তাই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই আদর্শকে সিলমোহরে অঙ্কিত করে তার ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে, জলের ঢেউগুলো কর্মের, পদ্মফুল ভক্তির, উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের, পুরো ছবিকে জড়িয়ে ধরা সাপটি যোগ ও কুণ্ডলিনী শক্তির এবং রাজহাঁসটি পরমাত্মার প্রতীক।

## রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্য

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্য হলো, “আত্মনো মোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায় চ”— নিজের মুক্তি ও জগতের হিত-সাধন।

## রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্যকলাপ

রামকৃষ্ণ সংঘের ভারতে প্রায় ১৫৭ টি এবং ভারতের বাইরে প্রায় ৫১ টি রেজিস্ট্রিকৃত কেন্দ্র আছে। সবগুলো কেন্দ্রের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বেলুর মঠ। এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে এবং স্বামীজীর পথনির্দেশে নানান রকম আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হয়। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী এই সংঘের রয়েছে ১৪ টি হাসপাতাল, ১১১ টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৫৬ টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা

সালয়, ৩৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৩ টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৮১ টি অন্যান্য বিদ্যালয়, ১২ টি মহাবিদ্যালয়, ১ টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭ টি ব্যক্তিগত শিক্ষাকেন্দ্র, ৭৮ টি নৈশ (প্রাপ্তবয়স্ক) বিদ্যালয়, ২ টি ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র, ১ টি বৈদিক শিক্ষাকেন্দ্র, ৪ টি শিল্প বিদ্যালয়, ৭ টি কুটিরশিল্প ও লঘু উদ্যোগীয় শিল্প, ১১১ টি ছাত্রাবাস, ৩ টি অনাথালয়, ৩ টি বৃদ্ধাশ্রম, ২৩৬ টি গ্রন্থাগার, ২০ টি প্রধান পুস্তক প্রকাশনী কেন্দ্র, ৫ টি বিকলাঙ্গ কেন্দ্র, ৩ টি কৃষি বিদ্যালয়, বহু গোশালা, ৪ টি গ্রাম্যবিকাশ শিক্ষাকেন্দ্র। এছাড়া রামকৃষ্ণ সংঘের অনেক কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মহামারীতে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা হয়। এর বাইরেও নানাবিধ দানের মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কাজ করা হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা মেটাতে ও তাদের উৎসাহিত করতে নানান পূজানুষ্ঠান ও সভার আয়োজন করা হয়। আবার সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সব ধর্মের আচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

### বেলুড় মঠের দর্শনীয় স্থানসমূহ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির, পুরাতন মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের কক্ষ, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বা রাজা-মহারাজের মন্দির, জগজ্জননী সারদা দেবীর মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দজীর মন্দির, সমাধিপীঠ, পুরানো মঠ, রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির এবং মঠের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

সঙ্কল্পগুরু পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজজীর নিবাস স্থান, মঠ অফিস, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়, মা সারদা সেবারত (অন্নপ্রসাদ দেওয়ার জায়গা), পল্লীমঞ্জল (গ্রামীণ হস্তশিল্প বিক্রয়কেন্দ্র), পুস্তকালয়, বিবেকানন্দ দর্শন (প্রদর্শনী কেন্দ্র), প্রতীক্ষালয় (দুপুরে মঠ বন্ধ থাকে, সেই সময়ে দর্শনার্থীরা এখানে অপেক্ষা করতে পারেন)

### বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

কোলকাতার বেলুর মঠ থেকে স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশনন্দ ১৮৯৯ সালে ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই দুই শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে পুরান ঢাকার টিকাটুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ১৯০৪ সাল থেকে এই মঠ ও মিশন বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রকাশনার কাজ শুরু করে। তারও বার বছর পরে বেলুর মঠ একে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

ঢাকার জমিদার, ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক যোগেশ চন্দ্র দাসের দান করা সাত বিঘা জমিতে এ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার দান করা জমিতে মন্দির, সাধু নিবাস, হাসপাতাল, স্কুল, সংস্কৃতি ভবন তৈরি করা হয়।

১৯১৬ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী পরমানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ওই বছরই পূর্ববঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল লর্ড কারমাইকেল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে নতুন মন্দিরের কাজ শেষ হয়।

বর্তমানে এই মঠটি বাংলাদেশস্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি অধ্যাত্মচর্চা এবং সমাজসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এরপর বাংলাদেশ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আরও কিছু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়— বরিশাল (১৯০৪), নারায়ণগঞ্জ (১৯০৯), মানিকগঞ্জ (১৯১০), সিলেট (১৯১৬), ফরিদপুর (১৯২১), হবিগঞ্জ (১৯২১), ময়মনসিংহ (১৯২২), দিনাজপুর (১৯২৩) ও বাগেরহাট (১৯২৬)। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন ছাড়াও এই কেন্দ্রগুলি চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা, ত্রাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজও পরিচালনা করে। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের চিকিৎসাকেন্দ্রটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর সহায়তায় কর্মকাণ্ড শুরু করে। বর্তমানে এটি মিশন পরিচালিত নানাবিধ সেবামূলক কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহযোগিতাসহ চিকিৎসাসেবা নিয়ে আতর্দের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে একটি স্কুল ও একটি গণগ্রন্থাগার আছে। এখানে ঢাকার বাইরে থেকে আসা উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাসও আছে। গণগ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক আছে, তার সঙ্গে আছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অনেক বই ও পত্রপত্রিকা। প্রতিদিন নানা বয়সের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখানে বই পড়তে আসে।

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকাণ্ড সকল ধর্মের মানুষের জন্যই উন্মুক্ত। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা-সহ ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ধর্মীয় একত্বের অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বছরব্যাপী বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক খ্যাতিমান পণ্ডিতবর্গ। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর তাঁর জীবনদর্শন নিয়ে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেশি-বিদেশি ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এখানে রচিত হয় সহাবস্থানের এক মিলনক্ষেত্র। এটিই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন এবং রামকৃষ্ণ মিশনেরও আদর্শ।

- রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বার সকল ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এই বক্তব্যের সমর্থনে ‘আবাহন’ ঘরে শিক্ষার্থীদের দু’টি যুক্তি লিখতে বলুন।

## শ্রীঅঞ্জন

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান শ্রীঅঞ্জন। বাংলাদেশে মহানাম সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় আশ্রম এই শ্রীঅঞ্জন। মহানাম সম্প্রদায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী। এই সম্প্রদায়ের আধ্যাত্ম দেবতা প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর ফরিদপুরের গোয়ালচামটে শ্রীঅঞ্জন প্রতিষ্ঠা করেন। মহানাম সম্প্রদায়ের সদস্যরা জগদ্বন্ধু সুন্দরকে কৃষ্ণের অবতার বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস শ্রী চৈতন্যদেব ও শ্রী নিত্যানন্দের মিলিত রূপে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রীঅঞ্জনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাব ২৮শে এপ্রিল ১৮৭১ সালে। তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে; নিজের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম শ্রীঅঞ্জনে। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ফরিদপুর শহরের কাছের গ্রাম গোবিন্দপুর। তবে তাঁর জন্ম হয়েছে বাবার কর্মস্থল মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া। তিনি শ্রীধাম শ্রীঅঞ্জন প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৯ সালে। শ্রীঅঞ্জনের জন্য জমি দান করেন শ্রীরাম সুন্দর ও শ্রীরাম কুমার



মুদি। দিনে দিনে শ্রীঅঞ্জন মহানাম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। জগদ্বন্ধু সুন্দরের তিরোধানের পরবর্তী মাস থেকে শ্রীঅঞ্জে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা অখণ্ড মহানাম সংকীর্তন চলছে।

ফরিদপুরের নতুন এবং পুরাতন বাসস্ত্যান্ডের মাঝামাঝি জায়গায়, ঢাকা-ফরিদপুর মহাসড়কের পাশেই শ্রীঅ-  
ঞ্জনের অবস্থান। স্থানীয়দের কাছে আশ্রমটি আঙিনা নামেই বেশি পরিচিত। কোলাহলমুক্ত, খোলামেলা,  
ছায়াঘেরা এই অঞ্জে এলে দর্শনার্থীর মন প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। প্রতিদিন এখানে প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন। তাদের  
মধ্যে কেউ কেউ এখানে রাত্রিযাপন করেন। তাদের জন্য রয়েছে থাকার ব্যবস্থা। শ্রীঅঞ্জনের একাধিক ভক্তা-  
বাসে অসংখ্য ভক্ত থাকতে পারেন। এখানে প্রতিদিন প্রভুর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করা হয়। ভক্তরাও এখানে  
প্রসাদ ভোজন করতে পারে। এই ভোগ ভক্তদের কাছে অমৃতসম মনে হয়। অনেকে আবার বিভিন্ন মানত করে  
প্রভুর আশ্রম থেকে মালসা ভোগের অর্ডার করে বিভিন্ন শুভ কাজ, যেমন অন্ত্রপ্রাশন জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী,  
মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি পালন করে।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে শ্রী শ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের জন্মতিথিতে আশ্রমে বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়, মেলা  
বসে। নাটমন্দিরে অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্তন হয়। সে সময়ে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা  
ইত্যাদি দেশের ভক্তরা প্রভুর পুণ্যভূমি দর্শন করতে আসেন।

শ্রীঅঞ্জনের প্রবেশপথের ডান দিকে শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু লাইব্রেরি আছে। সেখানে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের নানা গ্রন্থ,  
অনেক মূল্যবান ও দুস্প্যাপ ধর্মীয় গ্রন্থ, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, বেদ, আদি পঞ্জিকা ইত্যাদি পাওয়া যায়।  
এছাড়াও আছে নানান দেব-দেবীর ছবি, ঘরে সাজিয়ে রাখার মত ছোট মূর্তি, ঠাকুরের আসন, নিত্য প্রয়োজনীয়  
পূজার সামগ্রী ইত্যাদি।

শ্রীঅঞ্জে ঢুকতেই চোখে পড়বে একজন বৈষ্ণবের মূর্তি, যিনি তিলক হাতে আগতদের অভ্যর্থনা জানান।

এই অঞ্জে প্রার্থনার জন্য রয়েছে বেশকিছু মন্দির। প্রভু জগদ্বন্ধু সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, সীতা  
নবমী তিথিতে ব্রাহ্মমুহর্ত দীননাথ ন্যায়রত্ন তার স্ত্রী শ্রী বামাদেবীসহ ভোরে গঙ্গায় স্নান করতে যান। শিশু  
জগদ্বন্ধু একটি পদ্মফুলে ওপর শুয়ে ভাসতে ভাসতে সামনে এলে দীননাথ শিশুটিকে তুলে বামাদেবীর কোলে  
দেন। বামাদেবী জগদ্বন্ধুকে কোলে করে ঘরে গেলে জগদ্বন্ধু কেঁদে ওঠেন। তখন দীননাথ এবং বামাদেবী সকলকে  
জানালেন, “আমাদের ছেলে হয়েছে”। শ্রীঅঞ্জনের একটি মন্দিরে এই কাহিনিটি প্রতিমার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা  
হয়েছে। আছে একটি নৌকা মন্দির। এই মন্দিরের ভেতরে একটি নৌকা রাখা আছে। এই নৌকায় চড়েই প্রভু  
জগদ্বন্ধু ভক্তদের নিয়ে পদ্মা নদীতে বেড়াতে যেতেন, সাধুসঙ্গ ও কীর্তন করতেন এবং রাতের শেষভাগে ফিরে  
আসতেন। এই নৌকা মন্দিরে সেই নৌকাটির ওপর কিছু তৈরি করা অবয়ব এমনভাবে রাখা আছে যা দেখে মনে  
হয় যে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর মাঝখানে বসে আছেন আর তাঁর চারপাশে অনুসারী ভক্তবৃন্দ বসে কীর্তন করছেন।  
অঞ্জে আছে কাঠের তৈরি নান্দনিক রথ। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়ে হাজার হাজার লোক এই  
রথটিকে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আরেকটি আশ্রমে টেনে নিয়ে যান আবার ফিরিয়ে আনেন।

১৯৭১ সালে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে, ২১ এপ্রিল পাক-হানাদার বাহিনী ফরিদপুর শহরে আসে। তাদের  
সহযোগী ছিল একজন অবাঙালি ব্যক্তি। লোকটি হানাদার বাহিনীকে শ্রীঅঞ্জে নিয়ে আসে। বরাবরের মতন  
সেখানে নামসংকীর্তন চলছিল। তারা গাইছিল “জয় জগদ্বন্ধু। লসেআ ,লাঝাবে রদরৌটিলামি টিকালৌরাহবি”  
রএা বলছে “জয় বঙ্গবন্ধু”। তখনই মিলিটারিরা গুলি চালায়। নয়জন কীর্তনিয়ার মধ্যে কেবল একজন পালাতে  
পেরেছিল। বাকি আটজন মৃত্যুবরণ করেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর কেবল সেই সময়ে কয়েকদিনের জন্য



শ্রীঅঞ্জে কীর্তন বন্ধ হয়েছিল। আশ্রমে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। যে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে গুলি চালানো হয়েছিল তার নাম ছিল জামশেদ। শোনা যায়, দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন আগে ক্যাপ্টেন জামশেদ উন্মাদ হয়ে যায়। এরপর শ্রীঅঞ্জে এসে নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করে। সেই আটজনের সমাধি রয়েছে শ্রীঅঞ্জনের চালতা গাছ তলায়। প্রত্যেক বছরের একুশে এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে প্রচুর মানুষ শ্রীঅঞ্জে এসে এই আটজন শহীদের সমাধিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

এখানে আছে বিশাল রন্ধনশালা। আছে প্রসাদালয়; যেখানে প্রতিবছর উৎসবের সময়ে হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করে। আশ্রমের নিজস্ব গরুর খামারও আছে। যে পথে খামারে যেতে হয় সেই পথটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘ধেনুপথ’। এখানে অফিস আছে, আশ্রম আছে। একটি ছাত্রাবাসও আছে। সেখানে বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য নৃ-হয়েরে রাত্রাছ রীতাগে-ন্ রপুত্রনিমযৌষ্ঠাগে-

শ্রীঅঞ্জে আরও আছে তুলসী বেদী। আছে অনন্য সুন্দর নাটমন্দির। জগদ্বন্ধু সুন্দরের একটি অপব্রূপ বিগ্রহ আছে এখানে। এখানেই চক্ৰিশ ঘণ্টা নাম কীর্তন করা হয়। আছে প্রভু জগদ্বন্ধুর সমাধি, গম্ভীর সাধন গৃহ, আছে তাঁর বস্ত্র-সমাধি। এখানে আরও কিছু সমাধি মন্দির রয়েছে।

শ্রীঅঞ্জনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর নাম। তিনি মহানাম সম্প্রদায়ের একজন ধর্মীয় গুরু, লেখক, সংগঠক এবং দার্শনিক। তিনি প্রভু জগদ্বন্ধু সম্পর্কে জানবার পর তাঁক দেখবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। আশি মাইল পথ পায়ে হেঁটে বরিশাল থেকে ফরিদপুর শ্রীঅঞ্জে আসেন প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের দর্শন পেতে, সাধু হতে। কিন্তু বাবা-মায়ের অনুমতি না নিয়ে আসা ও এন্ট্রান্স পাশ না করার জন্য সে যাত্রায় তাঁকে ফেরত যেতে হল। সাধু হওয়ার তাগিদে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করে মায়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীঅঞ্জে আসেন। এখানে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য মহেন্দ্রজীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ব ধর্মসভায় যোগ দিতে যান। সেখানে তিনি বৈষ্ণব বেদান্তের ওপর শিক্ষাগ্রহণও করেন। আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপের নানা জায়গায় এ বিষয়ে ভাষণ দেন। এর প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পর তিনি দেশে ফেরেন। ফিরে আসেন শ্রীঅঞ্জে। তিনি মানুষের আধ্যাত্মবোধ এবং মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে শান্তিময় সমাজ গঠনের জন্য ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ছুটেছেন, তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। দেশভাগের পর শ্রীঅঞ্জনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে তিনি দুর্গতদের সহায়তা করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বিভিন্ন মঠ ও মন্দির সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

শ্রীঅঞ্জে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পল্লীকবি জসীমউদ্দীনসহ অনেক মহান ব্যক্তিত্ব। সুমহান ইতিহাস এবং বর্তমানের উপযোগিতা আশ্রম হিসেবে শ্রীঅঞ্জনকে একটি অনন্য মহিমা দিয়েছে। তাই শতবছরেরও বেশি পুরোনো এই অঞ্জন এখন কেবল মহানাম সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছেই নয় বরং, সারাবিশ্বের হিন্দু ধর্মবলম্বীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় তীর্থক্ষেত্র।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, শ্রীঅঞ্জন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখে, ছবি ঐঁকে, নকশা করে পাঠ্যবইয়ের ‘শ্রীঅ-ঞ্জন-কথা’ পোস্টারটি সম্পূর্ণ করতে।

## ধাপ-৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ৩ টি

- শিক্ষার্থীরা যে-সকল আদর্শ মানব এবং ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জেনেছে সেখান থেকে যেসব শিক্ষা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর তালিকা পাঠ্যবইয়ের ‘আমার ভুবন’ ছকে লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন, আদর্শ জীবনচরিত এবং ধর্মীয় সেবামূলক সংস্থা থেকে সে যে মূল্যবোধগুলো পেয়েছে সেগুলো হিন্দুধর্মীয় মূল্যবোধ। এবারে এই মূল্যবোধ থেকে পাওয়া শিক্ষা ও প্রেরণা
- সামাজিক জীবনে কী করে কাজে লাগাবে (জীবে প্রেম, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, সুন্দর আচরণ ইত্যাদি)
- মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে কী করে কাজে লাগাবে (স্বচ্ছাশ্রম, গাছ লাগানো, বয়স্কদের যত্ন, আশেপাশের এলাকা পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি )
- সে বিষয়ে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের ‘কল্যাণ কর্ম’ ছকে তালিকা করতে।
- শিক্ষার্থীদের বলুন তাদের তালিকা থেকে বাস্তবে হাতে-কলমে করবার জন্য একটি সেবামূলক কাজ বেছে নিতে। (স্কুল প্রাঙ্গণে গাছ লাগানো, পাখিদের খাবার দেওয়ার জন্য জায়গা তৈরি, পোশাক/শীতবস্ত্র বিতরণ, টাকা জমিয়ে দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য কাজ করা.....)
- বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাদের সেই কাজটি পরিচালনা করতে সহায়তা করুন।
- কাজটি করা শেষে বইয়ের নির্দিষ্ট ছকে ‘প্রতিফলন ডায়েরি’ লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ দিন। তাদের বলুন, পশুপাখি, গাছ-পালার জন্ম থেকেই পশুপাখি কিংবা গাছপালা। কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মালেই সে ‘মানুষ’ হয় না। মানুষ হতে গেলে কিছু কাজ করতে হয়, কিছু গুণ আয়ত্ত্ব করতে হয়। এই সেবামূলক কাজের মাধ্যমে তাদের মনুষ্যত্ব বিকশিত হচ্ছে। জীবনব্যাপী শিক্ষার্থীদের এই ধারা অব্যাহত রাখতে বলুন। ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিনিয়ত মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে কাজ করবার অনুপ্রেরণা দিন।

# তৃতীয় অধ্যায়

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### যোগ্যতা ৮.৩

হিন্দুধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা

### শিখন অভিজ্ঞতা ৮: পরমতসহিষ্ণুতা

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে—

- পরমতসহিষ্ণুতার ধারণা লাভ
- চিন্তায়, কাজে ও আচরণে ভিন্ন মতের প্রতি সহিষ্ণুতার প্রকাশ
- সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

### বিষয়বস্তু

#### পরমতসহিষ্ণুতা

#### অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা সকলের মত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এরকম একটি বিষয় নির্বাচন করবে। দুটি দলে ভাগ হয়ে প্রথম দল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে কোনো ঐক্যমতে পৌঁছাবে না। দ্বিতীয় দল সহিষ্ণুতার সঙ্গে মতামত দিয়ে আলোচনা করে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে। শিক্ষার্থীরা তাদের এই অভিজ্ঞতার আলোকে, দলে/জোড়ায় আলোচনা করে বইয়ের নির্দিষ্ট ছকে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং না দেওয়ার বিষয়ে তাদের অভি-ব্যক্তি প্রকাশ করবে এবং সকলের সামনে উপস্থাপন করবে।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শ্লোক, ঘটনা, বাণী জানানো ও আলাপচারিতার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্মের ‘পরমতসহিষ্ণুতা’র কথা শিক্ষার্থীদের জানানো হবে। তারা বুদ্ধি পূরণ, গল্পপাঠ, মেইজের খাঁখাঁ সমাধান ও লেখার

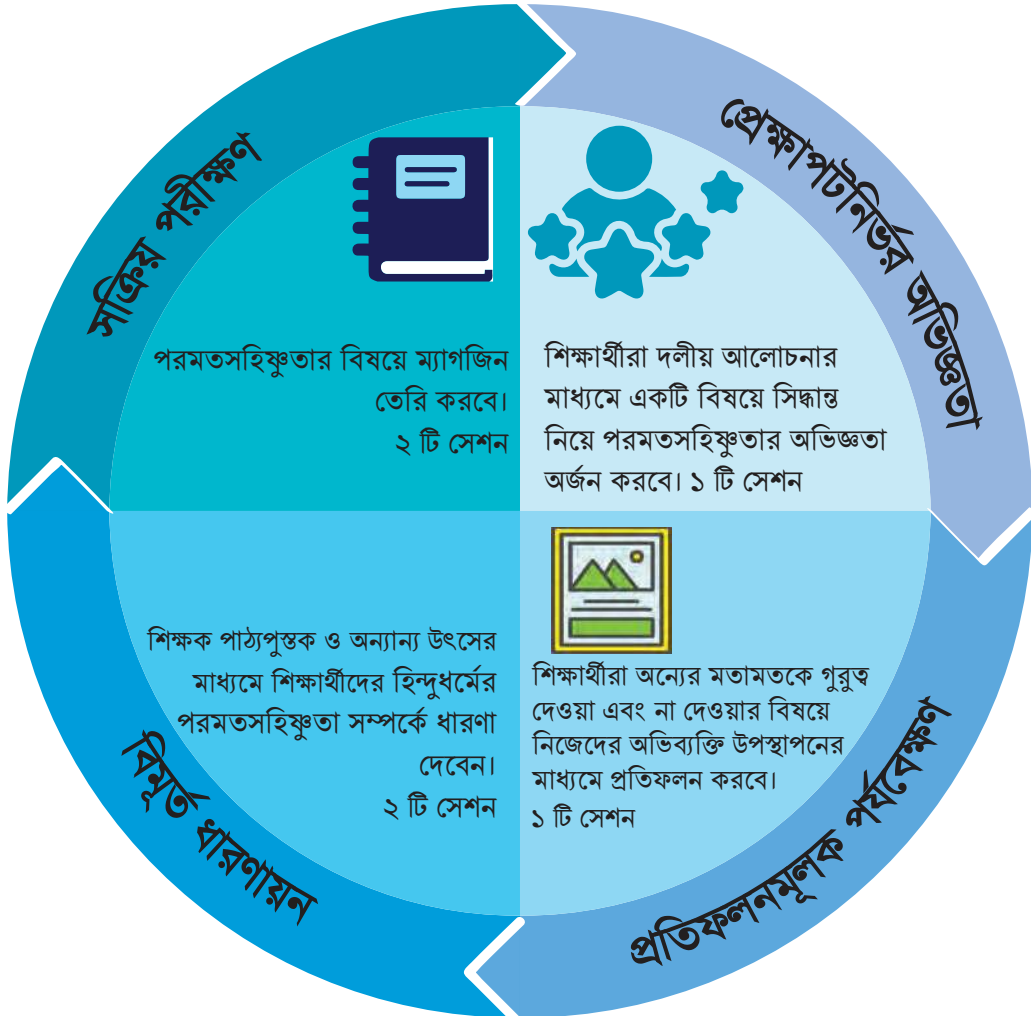
মাধ্যমে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করবে।

ম্যাগাজিন তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরমতসহিষ্ণুতার সক্রিয় পরীক্ষণ করবে।

### বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন।

অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৬ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করবেন।



## খাপ ১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা:

### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের এককভাবে পাঁচ রকমের পাতা সংগ্রহ করে, সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে ‘বৈচিত্র্যময় পৃথিবী’ ছকটি পূরণ করতে বলুন। কাজটি করার জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে পাতা সংগ্রহ করতে যেতে পারেন অথবা বাড়ির কাজ হিসেবেও দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা পাতার মধ্যে যে বৈচিত্র্য পেয়েছি তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করব। পোস্টার প্রদর্শনী, মাল্টিমিডিয়া, বক্তৃতা, পাতা প্রদর্শনী ইত্যাদি কোন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করলে সবচেয়ে ভালো হয় তা নিয়ে দুইরকমভাবে আলোচনা করব।
- শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ হতে সাহায্য করুন। (শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলে একটি দলই দুটি দলের কাজ করবে।)
- প্রথম দলকে বলুন, আমরা ‘পাতার বৈচিত্র্য উপস্থাপন পদ্ধতি’ বিষয়ে আলোচনা করব। আলোচনার সময়ে দলের প্রত্যেকে আলাদা আলাদা মত দেবো। এবং প্রত্যেকেই নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করব। সেজন্য প্রয়োজনে তর্ক-বিতর্কও করব। তাদের বলুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলোচনাটি শেষ করতে। প্রয়োজনে সময় বাড়িয়ে বা কমিয়েও দিতে পারেন।
- প্রথম দলের আলোচনা শেষে দ্বিতীয় দলকে বলুন, আমরাও একই বিষয়ে আলোচনা করব। তবে এখানে আমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করব সকলের সঙ্গে মিলিয়ে মতামত দিতে, অন্যের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনব এবং শেষ পর্যন্ত সবাই কম-বেশি পছন্দ করবে এরকম একটা সমাধানে পৌঁছাতে চেষ্টা করব।

## খাপ ২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

### সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন, কোন দলের আলোচনা তাদের ভালো লেগেছে? কেন লেগেছে? “প্রথম দলের আলোচনা ভালো লেগেছে, কারণ ওটা অনেক মজার ছিল”— এরকম উত্তরও আসতে পারে। যদি তেমনটা হয়, তাহলে প্রশ্ন করবেন, জীবনের সব ক্ষেত্রে যদি এমনটা ঘটে তাহলে তোমাদের কোন দলের আলোচনা ভালো লাগবে? আপনার কাঙ্ক্ষিত উত্তর হবে, “দ্বিতীয় দলের”। সুতরাং যতক্ষণ না এই উত্তর পাচ্ছেন ততক্ষণ বিভিন্ন কৌশলে প্রশ্ন করবেন।
- কেন দ্বিতীয় দলের আলোচনা ভালো লাগল/ এরকমটাই কেন কাম্য, প্রথম দলের মতন ঘটলে কী অসুবিধা হয়— এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় আলোচনা করতে দিন।
- শিক্ষার্থীদের নিজের মত অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ের ‘মতবৈচিত্র্য’ ছকটি পূরণ করতে দিন।
- প্রত্যেককে নিজের লেখা সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দিন।

## ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা যে অনুভব করেছে এবং জানিয়েছে যে একে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে জীবন সুন্দর হয় (শিক্ষার্থীরা যে ধরনের অনুভূতি ব্যক্ত করেছে সেটাই বলুন) এই বিষয়টিকে বলে ‘পরমতসহিষ্ণুতা’। হিন্দু ধর্মেও এই বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চলো আমরা সে সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিই।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণুতার ধারণাটি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

### সহায়ক তথ্য

যদি এই পৃথিবীতে কেবল একই রকমের প্রাণী থাকত, সবকিছুর রং এক হতো, সবাই একই পেশায় কাজ করত তাহলে ব্যপারটা কেমন হতো ভেবে দেখি। প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য না থাকলে সৃষ্টিজগত কি টিকে থাকতে পারত? তেমনি মানুষে মানুষে যে মতভিন্নতা সেটিও জরুরি। সবার পছন্দ, সবার মতামত যদি একরকম হতো তাহলে কেমন হতো আসলে? পৃথিবীর উপাদান, মানুষের মতামতের মতন প্রকৃতির নিয়মেও বৈচিত্র্য আছে। আবার এই সকল বৈচিত্র্যের মাঝে আছে ঐক্য। বৈচিত্র্যকে যেমন স্বীকার করতে হয়, তেমনি ঐক্যের নিয়মকেও মানতে হয়। যদি আমরা প্রকৃতির নিয়মকে না বুঝি, যদি নিয়মগুলোকে মেনে না মেনে চলি তাহলে যে গ্রিন হাউস ইফেক্টের মতন বিপর্যয় ঘটে তা তো আমরা জানিই। এবারে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে ঐক্যবদ্ধতার বিষয়ে আমাদের হিন্দুধর্ম কী বলছে জেনে নিই।

সকলে সহমত হলে শান্তি আসে না, শান্তি তখন আসে যখন ভিন্ন মতের প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ রেখে আমরা পাশাপাশি চলতে পারি।

শিব মহি্ম স্তোত্রে বলা হয়েছে—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাম্।

নৃণামেকো গম্যস্বমসি পয়সামর্গব ইব।।

অর্থাৎ বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই একই সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়। তেমনি নিজের রুচির বৈচিত্র্যের কারণে সোজা-বাঁকা নানা পথে যারা চলেছে, হে ঈশ্বর, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

বৈচিত্র্যময়তা যেমন পৃথিবীকে সুন্দর করেছে, তেমনি সংঘাতেরও সুযোগ তৈরি করেছে। এই সংঘাত এড়াতে প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতার। ব্যক্তি জীবন থেকে বৃহত্তর সমাজ জীবনে সুন্দরভাবে বাঁচবার জন্য পরমতসহিষ্ণু হওয়া খুবই জরুরি। তাহলে জয়শ্রী, অনির্বাণ, নীলাদ্রি, মেঘদীপা কিংবা রফিক, সুলতানা, ব্রাভেন, জেনোলিয়া, আনুচিং, রাহুল সকলের জীবনই আনন্দময় হতে পারে।

পরমতসহিষ্ণুতার মানে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কেবল নিজে মত দেওয়া নয়, অপরকেও মতামত দেওয়ার সুযোগ দেওয়া। নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও অন্যের মতকে গুরুত্ব দেওয়া। সকলের মত প্রকাশের অধিকারকে সাদরে গ্রহণ করা। পরমতসহিষ্ণুতা শিষ্টাচারের অঙ্গ, একই সঙ্গে ধর্মেরও অঙ্গ। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম সত্য, সুন্দর, কল্যাণের কথা বলে। প্রতিটি ধর্মই পরমতসহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা দেয়।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।

সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়াগি বঃ।

সমানমন্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

(ঋগ্বেদ: ১০.১৯১.২-৪)

**সরলার্থ:** হে মানব, তোমরা একসঙ্গে চল, একসঙ্গে মিলে আলোচনা কর, তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক। তোমাদের পূর্বকালীন জ্ঞানী ব্যক্তির যেরকম কর্তব্য পালন করেছে, তোমরাও তেমনটাই করো। তোমাদের সকলের মিলনের মন্ত্র এক হোক, মিলন ভূমি এক হোক, মনসহ চিত্ত এক হোক। তোমাদের সকলকে আমি একই সাম্যের মন্ত্র এবং খাদ্য ও পানীয় দিয়েছি। তোমাদের সকলের হৃদয়ের আকুতি এক হোক, হৃদয় এক হোক। মন এক হোক, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।

মানবজাতির মধ্যে ভিন্নমত, বৈচিত্র্য থাকলেও পরমতসহিষ্ণুতার চর্চার মাধ্যমে বেদ-এ মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এই ঐক্যবদ্ধতার আহ্বানকে আমরা বাস্তব-রূপ দিতে পারি।

শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের বক্তারা শ্রোতাদের প্রথাগতভাবে ‘ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ’ সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সবাইকে ‘ভ্রাতা ও ভগিনী’ বলে সম্বোধন করেন। অজানা-অচেনা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেয়ার মানসিকতা দেখে শ্রোতার মুগ্ধ হন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তব্যে বলেন, “হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক— ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।”



সেখানে অনেকেই কেবল নিজ—নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বললেন, “যে ধর্ম অন্যকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতার ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি।”

হিন্দুধর্মের অনুসারী হিসাবে, দৈনন্দিন জীবনে পরমতসহিষ্ণুতার নীতিগুলি প্রয়োগ করা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রতিবেশী, সহপাঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চা আমার চেয়ে আলাদা হলেও তাকে সম্মান করা উচিত। বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্ম সম্পর্কে জানবার জন্য আমাদের মনকে উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এভাবে আমরা বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

হিন্দু দর্শন অনুযায়ী, আমাদের শরীরটা আসল ‘আমি’ নয় আসল ‘আমি’ হলো আমাদের চৈতন্য বা জীবাত্মা; যা পরমাত্মারই অংশ। চৈতন্য দেহটাকে আশ্রয় করে আছে কেবল। তাই একের থেকে অপরের বাইরের আবরণে, আচরণে তফাৎ হয় কিন্তু সকলের ভেতরে একই সত্তা। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী একবার ছেলেমানুষ কার্তিকে অকারণে একটা বেড়ালকে বল্লমের খোঁচা দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখলেন মা ভগবতীর মুখে আঘাতের চিহ্ন। কার্তিক এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে মা জবাব দিলেন, এ তোমারই বল্লমের আঘাত। কার্তিক বললেন, আমি একটা বেড়ালকে আঘাত করেছি বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ! ভগবতী জবাব দিলেন, আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছি। সমস্ত প্রাণীই আমার সন্তান। তুমি যাকে আঘাত করো, সে আঘাত আমাতেই লাগে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘মানুষ জাতি’ কবিতায় বলেছেন—

“কালো আর ধলো বাহিরে কেবল

ভিতরে সবারই সমান রাঙা।”

বিশ্বের সকল মানুষের গায়ের রং, পোশাক, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি নানান কিছুতে রকমফের আছে, ভিন্নতা আছে দৃশ্যমান ‘আমি’তে। কিন্তু ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে আসলে কোনো আত্মিক দূরত্ব নেই। সকলের আত্মা সেই এক পরমাত্মার অংশ। কালের নিয়মে সকলের আত্মাই এক পরমাত্মায় মিশে যাবে। আমাদের ইহজাগতিক জাতিভেদ, ধর্মভেদ, মতভেদ— সমস্তই অসহিষ্ণুতার ফল। পরমতসহিষ্ণুতাই পারে এইসব ভেদচিহ্ন মুছে দিতে। যে-কোনো ধর্মপ্রাণ, মানবতাবাদী মানুষের প্রধানতম গুণ হলো পরমতসহিষ্ণুতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হিন্দুধর্মীয় নানা পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে গল্প বলার মাধ্যমে ভক্তদের উপদেশ দিতেন। পরমতসহিষ্ণুতার বিষয়ে তিনি এই গল্পটি বলতেন—

### ঘণ্টাকর্ণ

এক লোক দিনরাত শিবের আরাধনা করত। অপরদিকে অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি ভক্তি দেখানো তো দূরের কথা, লোকটি তাঁদের রীতিমতো ঘৃণা করত। একদিন শিব তাকে দেখা দিয়ে বললেন, “সব দেবতাই তো এক। একজনকে ঘৃণা করলে সকলকেই ঘৃণা করা হয়। তুমি যতদিন না অন্যান্য দেবতাদের ভক্তি করবে ততদিন আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হব না।” কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো; লোকটি প্রকাশ্যে শিব বাদে বাকি সকল দেব-দেবীর নিন্দা করতে লাগল। তাদের নাম শুনলেও ক্ষেপে উঠতে লাগল। দিনে দিনে এই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। তাকে ক্ষেপানোর জন্য ছেলেপিলের দল কানের কাছে ‘শ্রীবিষ্ণু’ বলে চোঁচাতে শুরু করল। লোকটি তখন অন্য কোনো দেব-দেবীর নাম কানে শুনতেও নারাজ। তাই সে দুই কানে দুইটা ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিল। ছেলের দল যখনই শ্রীবিষ্ণুর নাম করে তখনই সে প্রবলভাবে মাথাটা নাড়াতে থাকে। তখন ঘণ্টার আওয়াজে তার কানে আর বিষ্ণু নাম যায় না। গৌড়ামির জন্য সে সকলের এমন ঘৃণার পাত্র হলো যে, আজও ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে লোকে ঘণ্টাকর্ণের মূর্তি গড়ে ভেঙে ফেলে।

এই গল্পটির উপদেশ হলো এই যে, ধর্মের গৌড়ামি মহাপাপ। সকল ধর্মেই সত্য আছে— যে তা না দেখে সে কখনই ধার্মিক নয়।

শিক্ষার্থীদের ‘ঐকতান’ ছকের বক্তব্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে, ভালোভাবে বুঝে পাশের উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করতে বলুন।

- রুব্রিক্সটির মূল্যায়ন মানের ব্যাখ্যা : ১- প্রারম্ভিক, ২- বিকাশমান, ৩- অগ্রসর

বক্তব্য	সহমত	আংশিক সহমত	সহমত নই
মানুষে মানুষে মতের ভিন্নতা না থাকলে পৃথিবী আনন্দময় হতো।	১	২	৩
পরমতসহিষ্ণুতা যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়াতে সাহায্য করে তেমনি অন্যায়কে সহ্য করার মতন পরিবেশও তৈরি করে।	২	৩	১
বেশির ভাগ মানুষ ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন।	১	২	৩
পরস্পরের ভাবগ্রহণের জন্য পরস্পরের সম্পর্কে জানা জরুরি।	৩	২	১
হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা বা অন্য কোনো ধর্ম মত মেনে চলার উদ্দেশ্য এবং ফলাফল একই।	৩	২	১
সকল মানুষের মনসহ চিন্তা এক হতে হলে পৃথিবীতে ধর্মও একটি হওয়া প্রয়োজন।	১	২	৩

সকল ধর্মমত একই পথে চলে।	১	২	৩
পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই সত্য; প্রতিটি ধর্মই গুরুত্বপূর্ণ।	৩	২	১
যে ব্যক্তির নিজস্ব মতামত প্রকাশের যোগ্যতা নেই তার কাছে পরমতসহিষ্ণুতার গুণ আশা করা যায় না।	৩	২	১

মনুসংহিতায়ও সহিষ্ণু হতে বলা হয়েছে, “ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥ (৬/৯২)” অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, আত্ম-সংযম, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৃঙ্খলবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং ক্রোধহীনতা— ধর্মের এই দশটি লক্ষণ।

‘বিবিধের মাঝে মিলন মহান’—এটাই হিন্দুধর্মের মূল চেতনা। একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ব্যক্তির মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, বিভিন্ন মত ও পথের প্রতি সীমাহীন সহিষ্ণুতা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ থাকা আবশ্যিক। হিন্দুধর্ম যেমন অন্য ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা দেয় তেমনি এই একই ধর্মের ভেতরে বহু মত ও পথের সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়; এখানে অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন- ‘যত মত তত পথ’। বেদ, উপনিষদার, মায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসহ প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই জীবের প্রতি ভালোবাসার কথা, মানবকল্যাণের কথা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাম্যের বাণী প্রচারিত হয়েছে। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলেছেন- “ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য এসবই জগতের ব্যবহারিক সত্য, মনের সৃষ্টি। আমি যে জগতের লোক সেখানে নেই কোনো ভেদ, সেখানে সবই সমান-সবই সুন্দর” ॥ এরকম ভেদবুদ্ধিহীন হওয়ার মূলসূত্র পরমতসহিষ্ণুতা।

- শিক্ষার্থীদের কুয়ার ব্যাণ্ডের গল্পটা পড়তে দিন।

### কুপমণ্ডুক

একটা কুয়ার মধ্যে থাকত এক ব্যাঙ। সেই কুয়াতেই সে জন্মেছে, সেখানেই বেড়ে উঠেছে। কুয়ার জলের মধ্যে জন্মানো পোকামাকড় খেয়েই জীবন কাটিয়েছে। কোনোদিন কুয়ার বাইরে যাবার কোনো প্রয়োজনই ব্যাঙটি বোধ করেনি। সেই কুয়ায়ও কেউ কোনোদিন আসেনি। তাই কুয়ার বাইরের পৃথিবীর খবর আমাদের গল্পের ব্যাঙটির একেবারেই অজানা। একদিন হঠাৎ কোথা থেকে একটা ব্যাঙ এসে সেই কুয়ায় উপস্থিত হল—

কুয়ার ব্যাঙ: কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

নতুন ব্যাঙ: সমুদ্র থেকে আসছি।

কুয়ার ব্যাঙ: সমুদ্র? সে কত বড়?

নতুন ব্যাঙ: সমুদ্র অনেক বড়।

কুয়ার ব্যাঙ: বটে! তা সে কি আমার এই কুয়ার মতো বড়?

(এই বলে কুপমণ্ডুক মানে কুয়ার ব্যাঙটি কুপের এক

প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে লাফ দিল।)

নতুন ব্যাঙ: ওহে ভাই, তুমি এই ক্ষুদ্র কুপের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করবে কী ক'রে?

(এই কথা শুনে কুপমণ্ডুক আরও একবার লাফ দিল।)

কুয়ার ব্যাঙ: তোমার সমুদ্র কি এত বড়?

নতুন ব্যাঙ: সমুদ্রের সঙ্গে কুয়ার তুলনা করে তুমি অত্যন্ত মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছ!

কুয়ার ব্যাঙ: আমার কুয়ার মতো বড় পৃথিবীতে আর কিছুই হতে পারে না।

তুমি নিশ্চয়ই মিথ্যা বলছ! তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত!

- শিক্ষার্থীদের ‘কুয়ার ব্যাঙ’ গল্পটা নিয়ে ভাবি ও লিখি কাজটি করতে বলুন।

কারোর সঙ্গে আমার মত মিলছে না বলে ধরে নেবো না যে তার মতটা ভ্রান্ত। একজন মানুষ আমার পথে হাঁটছে না বলেই ধরে নেবো না যে, সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন, যারা অন্য দেবতায় ভক্তিমান হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের পূজা করে, তারা ঈশ্বরেরই পূজা করে (৯/২৩)। সুতরাং সকল ধর্মের মানুষই তাদের নিজ নিজ মত ও পথ অনুসরণ করে একই ঈশ্বরের উপাসনা করে।

- শিক্ষার্থীদের সব পথেরই গন্তব্য এক মেইজটির সমাধান করতে বলুন। এখানে চারটি ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি পথই বেছে নেবে। তারপর এক সময়ে লক্ষ করবে সবগুলো পথই কেন্দ্রে পৌঁছানো যায়।

বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনেকেই নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে এসেছেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা তাদের ভাবনার প্রসারে নানাবিধ বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকগণও অনেক বাধা-বিপত্তির মুখে পড়েছেন। কিন্তু আমাদের এই অঞ্চল এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এখানে সুপ্রাচীনকাল থেকেই পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা হয়েছে। তাই এখানে ধর্মপ্রচারকদের অভিজ্ঞতাও ব্যতিক্রম। এই অঞ্চলে হিন্দুধর্ম যেমন বিকশিত হয়েছে। তেমনি অন্যান্য ধর্মমতের বিকাশও ঘটেছে সাবলীলভাবে।

পৃথিবীর সকল প্রাণীর মঙ্গলকামনার উদার প্রার্থনা এখানকার মানুষ সাত হাজার বছর আগে থেকে করছে।

সংস্কৃত ভাষার একটি প্রচলিত শ্লোকে বলা হয়েছে—

সর্বো ভবন্তু সুখিনঃ সর্বো সন্তু নিরাময়া

সর্বো ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগভবেৎ।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

যার অর্থ সবাই সুখী হোক, সকলে আরোগ্য লাভ করুক, সকলে কল্যাণ লাভ করুক, যেন কেউ দুঃখ ভোগ না করে। জগতের সকল প্রাণী শান্তি লাভ করুক।

হিন্দুধর্ম ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ একটি ধর্ম। এই ধর্মে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান রকমের বিশ্বাস ও অনুশীলনের সমন্বয় ঘটেছে। হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় চর্চাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সাদরে গ্রহণ করে। তাই একজন মানুষ হিসেবে যেমন তেমনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবেও আমরা পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করব।

## খাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

### সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করবে এ নিয়ে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট ছকে গল্প/কবিতা/ অনুচ্ছেদ/ নাটিকা লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের কাজগুলো দেখে ফিডব্যাক দিন। লেখাগুলো প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে আলাদা কাগজে সুন্দর করে তুলতে বলুন।
- এবারে সকল শিক্ষার্থীর লেখাগুলো একসঙ্গে যোগ করে ম্যাগাজিন তৈরি করতে বলুন।
- ম্যাগাজিনটি সকলের পড়ার জন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করুন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বন্ধু/ শিক্ষক/ পরিচিতজনদের কাছ থেকে তাদের ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা নিয়ে কী বলা হয়েছে তা জেনে নিতে। শিক্ষার্থীরা যদি যথেষ্ট তথ্য না পায় তখন আপনি এই শিক্ষক সহায়িকার শেষের লেখাগুলো থেকে জেনে নিয়ে জানাবেন।
- অষ্টম শ্রেণির বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে সকলে মিলে একটি মেলার আয়োজন করুন। প্রত্যেক ধর্মের শিক্ষার্থীরা সেখানে তার ধর্মের পরমতসহিষ্ণুতার কথাগুলো তুলে ধরবে।
- শিক্ষার্থীদের বলুন, মেলায় প্রদর্শনের জন্য হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা নিয়ে দলীয়ভাবে অনেকগুলো পোস্টার তৈরি করতে।

- ম্যাগাজিন তৈরি ও মেলার অভিজ্ঞতার আলোকে টিক/ ক্রস চিহ্ন ও মন্তব্য দিয়ে ‘ধর্মীয় সহিষ্ণুতা’ ছকটি পূরণ করতে বলুন।
- আগের রুরিক্সের সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তার কোনো বদল এসেছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- নিজের আচরণে পরমতসহিষ্ণুতার উদাহরণ সৃষ্টি করুন, শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন আচরণে পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করুন এবং জীবনব্যাপী তা লালন করবার অনুপ্রেরণা দিন।
- আপনি নিচের তথ্যগুলো ভালোভাবে পড়বেন। শিক্ষার্থী অন্যান্য ধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তথ্যগুলো জানাবেন।

## অন্যান্য ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

### ইসলাম ধর্ম

ইসলামের দৃষ্টিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শনই পরমতসহিষ্ণুতা। কারো কথা, কাজ বা ব্যবহারে কোন রকম ক্রোধান্বিত বা প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতার সাথে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করাই পরমতসহিষ্ণুতা।

প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.) -এর মহৎচরিত্রের মধ্যে সহিষ্ণুতা অন্যতম। পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা তাঁর চরিত্র-কে আরো উজ্জ্বল করেছে। মহানবি (সা.) ও চার খলিফা অন্যের মতামত ও বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইতিহাসে তার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। পবিত্র কুরআনে সহিষ্ণুতার মহৎ গুণটি অর্জনের জন্য জোরাল তাগিদ রয়েছে।

ইসলাম মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নির্দেশনা দিয়েছে। এ জন্য অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা যাবে না। মক্কায যারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত তারা একবার রাসুল (সা.) এর কাছে এসে বলল, ‘আপনি কিছুদিন আমাদের নিয়মে উপাসনা করুন, আমরাও আপনার নিয়মে ইবাদত করব।’ এই প্রস্তাব শুনে তিনি তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য না করে ধৈর্যধারণ করলেন। এমনই সময় ওহি নাযিল হলো, “আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা করছো। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের আমার দীন আমার”। (সূরা কাফিরুন, আয়াত: ৪-৬)

মহানবি (সা.) -এর পরমতসহিষ্ণুতার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। যেমন: ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হদায়বিয়ার শান্তি চুক্তির শুরুর কুরাইশ প্রতিনিধি ‘রাসুলুল্লাহ’ লিখতে আপত্তি জানায়। সাহাবিগণ কিছুতেই এই প্রস্তাব মানছিলেন না। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে কলম দিয়ে ‘রাসুলুল্লাহ’ শব্দটি কেটে দিলেন। শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রস্তাবটি মেনে নিলেন; পরমতসহিষ্ণুতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

ইসলামে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। এজন্য নিজের মত বা বিশ্বাস অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অপরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু না হওয়ার শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, “তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ইমান আনত; তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে”? (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯)

যে কোন সামাজিক ও ধর্মীয় বিতর্কে প্রামাণ্য, নির্ভরযোগ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এ কারণে ইসলাম আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও ইসলামের দাওয়াত প্রদানে প্রামাণ্যে বুদ্ধি-জ্ঞান ও সহিষ্ণুতার প্রতি গুরুত্ব

আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, “মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে; তাদের না আছে জ্ঞান, তা আছে পথনির্দেশ, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব”(সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত :৮)। তাই আন্তঃ-ধর্মীয় সংলাপ বা সমালোচনার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রামাণ্য যুক্তি ব্যতিরেকে বক্তব্য প্রদান উচিত নয়।

ইসলামে সকলের প্রতি মার্জিত সম্বোধনের স্পষ্ট নির্দেশনা আছে। এখানে ইসলামের অনুসারী এবং ভিন্ন ধর্মে অনুসারীদের মধ্যে কোনো ভেদ করা হয়নি। কেননা ভদ্র ও মার্জিত ‘সম্বোধন’ সহষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ও বিষয়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব রক্ষার জন্য ‘মার্জিত সম্বোধন’ একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। আল-কুরআনের বিভিন্ন ‘সম্বোধন’ থেকে আমরা মার্জিত সম্বোধনের দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকি। মহান আল্লাহ নিজেকে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছেন; কেবল মুসলমানদের রব বলে নয়। মহান আল্লাহ সকল শ্রেণির মানুষকে একত্রে একই ভাষায় সম্বোধন করেছেন। কখনও তিনি ‘হে মানব সম্প্রদায়’, কখনও ‘হে মানব জাতি’, কখনও ‘হে কিতাবধারী’ বলে সম্বোধন করেছেন।

জাতি, ধর্ম, গোত্র ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর এই অসাম্য সম্বোধন নিঃসন্দেহে আন্তঃ-ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতা অনন্য শিক্ষা। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আল কুরআনের মর্যাদাপূর্ণ ও মার্জিত সম্বোধন মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে। কারো প্রতি অসম্মানজনক ও অমার্জিত আচরণতো দূরের কথা, বরং কুরআন মাজিদের কোথাও ‘হে অমুসলিম’ বলে সম্বোধনের এতটুকু শব্দও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামের এই ‘মার্জিত সম্বোধন’ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে বিনয়ী হওয়া অপরিহার্য। কুরআন মাজিদে বর্ণিত মুসা (আ.) ও ফিরাউনের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনয়ী ও কোমল আচরণের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

সর্বোপরি ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করেছে। অন্যের মতামতের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিয়েছে। তবে কোনো উগ্র মতামত ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য সমর্থন করে না। প্রতিটি ধর্মমতের নিজস্ব বিধিবিধান আছে। ধর্মচর্চার নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি আছে। এক্ষেত্রে নিজের ধর্মকে মানার পাশাপাশি অন্যকে ধর্ম পালনের সুযোগ করে দেয়া ইসলামের শিক্ষা।

## বৌদ্ধধর্ম

### সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা বলতে কী বোঝায়

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। তিনি জন্মেছিলেন প্রাচীন ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে। সে সময়ের ভারতবর্ষে জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য প্রথার প্রচলন ছিল। শ্রেণি বিভাজনের প্রকোপ ছিল সমাজ প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সে প্রাচীন কুসংস্কার গৌতমবুদ্ধকে স্পর্শ করেনি। তথাগত বুদ্ধ প্রচার করলেন মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নাই। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার কর্মে। জন্ম দিয়ে মানুষের শ্রেণি বিভাজন হয় না। যেকোনো ব্যক্তি সম্প্রদায় হিসেবে ভিন্ন মতাদর্শের হলেও মানুষ হিসেবে সকলেই অখণ্ড মানব সমাজের উপাদান। সে অর্থে মানুষ পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোত্র ইত্যাদি ব্যক্তিকে নিদিষ্টকরণের পরিচায়ক শব্দমাত্র। তথাগত বুদ্ধ কখনো কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে কোনো বাণী প্রদান করেননি। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র মানবজাতি তথা সর্ব সত্ত্বার কল্যাণেই তাঁর বাণী প্রদান করেছেন। তাঁর এই সর্বজনীন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি আত্মসচেতন হতে পরামর্শ দিয়েছেন। আত্মপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের কথা বলেছেন। বিবেক জাগ্রত করার কথা বলেছেন। যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চিনতে পারবে। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে নিজের করণীয় বা আচরণ সম্পর্কে



সচেতন হবে। পারস্পরিক মূল্যবোধ ও সম্মানবোধ সমুন্নত রাখার কথা বলেছেন। মানুষে মানুষে এই অকৃত্রিম আন্তরিক সম্পর্কই সৌহার্দ্য। এরকম আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সহায়তা ও সহানুভূতির আগ্রহবোধ জাগ্রত হয় সেটিই হলো সহমর্মিতা। পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্ক সৃষ্টিতে এরূপ চর্চার গুরুত্ব রয়েছে। এই চর্চা হবে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। যা মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিকতাকে বিকশিত করবে। এর জন্য মানুষের সং ও ন্যায় পরায়ণ হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি পরমতসহিষ্ণু হওয়াও একান্ত আবশ্যিক। পরমতসহিষ্ণুতা হলো অপরের মতামতকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে বিবেচনা করা। মানব জীবনে এই সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

### সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার প্রয়োজনীয়তা

তথাগত বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষে প্রায় বাষট্টি প্রকার ধর্ম মতের প্রচলন ছিল। সেই ধর্মমতের অনেকগুলোর অনুসরণকারী ছিল অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক মানুষ। সেই ধর্মমত প্রচলনকারীদের সাথে বুদ্ধের অবাধ মেলামেশা ছিল। বুদ্ধ কোনো ধর্মীয় মত ও পথকে কেন্দ্র করে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি বরং তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে বলেছেন, “এসো, দেখ, উপলব্ধি করো, স্থায়ী জ্ঞানে বিশ্লেষণ করো, প্রয়োজন মনে হলে গ্রহণ করো।” সেজন্য বুদ্ধ ব্যক্তি স্বাধীনতা বা স্থায়ী চেতনাকে জাগরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পণ নয়, আপন কর্মের মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে। কোনো ধর্মমত খারাপ বা ভাল এই মন্তব্য তিনি করেননি। এমনকি তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শনের প্রতিও তিনি কাউকে গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করেননি। তিনি শুধু বলেছেন প্রত্যেকের নিজ নিজ অন্তর চৈতন্যে জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত করতে। যার মাধ্যমে মানুষ কর্মে ও চিন্তায় সত্য, সুন্দর ও নিষ্ঠাবান হয়। অর্থাৎ, কে কোন ধর্ম মতের অনুসারী সেটি বড় কথা নয়, নিজের চেতনা ও কর্মকে আদর্শবান ও নৈতিককতা সম্পন্ন করা একান্ত আবশ্যিক। এভাবে তিনি সকল প্রকার মতাদর্শের সাথে তাঁর চিন্তার সমন্বয় করতেন। সে কারণে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁর ধর্মাদর্শে স্থান পেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পরস্পর শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসা ছাড়া সর্বজনীন সম্প্রীতি গড়ে ওঠে না। আবার এই বোধ বিহীন পরিবার, সমাজ এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও শান্তিময় পারবেশ সৃষ্টি হয় না। তাই মানুষের জীবনে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সেই কারণে বলা যায়, মানুষের জীবনে পরিবার, সমাজে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার প্রয়োজন অপরিসীম।

### সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার গুরুত্ব

সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা বোধ মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা ছাড়া পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কখনো সুন্দর মানবিক পরিবেশ গড়ে ওঠে না। তাই তথাগত বুদ্ধ সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক মৈত্রী ও সম্ভাব বজায় রাখার কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে উদারতার সৃষ্টি হয় এবং সংকীর্ণতাশূন্য হয়। আমাদের জীবনে এই পারস্পরিক সুসম্পর্ক বা সৌহার্দ্যবোধের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতাবোধের কারণেই মানুষের অন্তর হতে বৈরী ও ঈর্ষাভাব দূর হয়। মনে বিরোধ চেতনার পরিবর্তে সম্প্রীতির জাগরণ হয়। অন্তর হতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিদূরিত হয়। মানবিক মূল্যবোধে উদ্বোধিত মানুষের অন্তর জগত। মানুষ পরিচিত হবে তার আপন কর্ম ও আচরণের ভিত্তিতে। জন্ম ও কোনো প্রথার ভিত্তিতে নয়। কর্ম ও অনুশীলিত আচরণই হলো ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয়।

পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করা অপরিহার্যভাবে দেখা দিয়েছে। তাই আন্তঃসামাজিক ও আন্তঃসম্প্রদায়গত সম্প্রীতির বৃহত্তর লক্ষ্যে এর অনুশীলন আমাদের করা উচিত।

যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা আমাদের অন্যের আচরণ এবং মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। যীশু বলেছেন, “কিন্তু আমি তোমাদের বলছি তোমাদের সংগে যে খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করো না বরং যে কেউ

তোমার ডান গালে চড় মারে তকে অন্য গালে চড় মারতে দিয়ো।” (মথি ৫:৩৯)

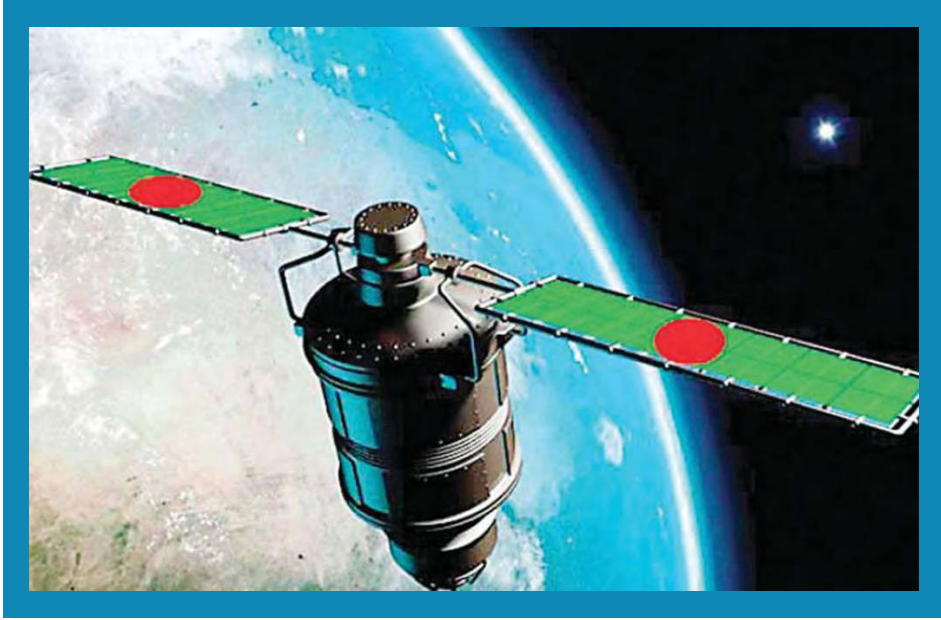
এ বাণীর মাধ্যমে যীশু আমাদের সহনশীল হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। যীশুর উপদেশ অনুযায়ী আমরা প্রতিশোধ-ধরায়ণ না হয়ে সহনশীল হবো যাতে মানুষের মধ্য থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়।

যীশুর সময়ে যিহুদী ও অযিহুদীদের মধ্যে সম্ভাব ছিল না। এর ফলে সমাজে রেষারেষি ও হিংসা-বিদ্বেষ ছিল। যীশু উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যেন সম্ভাব নিয়ে মিলেমিশে থাকে। সকল মানুষ যেন পরমতসহিষ্ণু হয় অর্থাৎ অন্যের আচরণ ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। আমরা সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান এবং তিনি সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন। যীশু এ বিষয়ে বলেছেন, “আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালোবাসো। যারা তোমাদের অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপর তার সূর্য ওঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন।” (মথি ৫: ৪৩-৪৫) ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা পরস্পর ভাই। ভাইকে অশ্রদ্ধা করে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। যীশু পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে নয়। তাই আমরা অন্যায়কারীকে সুপরামর্শ দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনব। তাদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করবো। প্রার্থনা, ক্ষমাশীলতা ও সহিষ্ণুতা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও ধর্মানুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূর করে। যীশু খ্রীষ্টের ভালোবাসা ও ক্ষমার বাণী মানুষকে পরমতসহিষ্ণু হতে অনুপ্রাণিত করে। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং ভিন্ন জাতি, গোত্র, বর্ণ ও পেশার হলেও আমরা একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। পরমতসহিষ্ণুতা ব্যতীত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়।

পরমতসহিষ্ণুতা গুণ তাদেরই আছে যারা আচরণে নম্র, ধৈর্যশীল এবং নিজ অন্তরে অন্যের জন্য ভালোবাসা অনুভব করে। পবিত্র আত্মার দেওয়া শান্তিতে আমরা সবাই মিলেমিশে বসবাস করি এবং সবসময় একতা রক্ষা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা করি। ইফিষীয় ৪:২-৩ পদে বলা হয়েছে “তোমাদের স্বভাব যেন সম্পূর্ণরূপে নম্র ও নরম হয়। ধৈর্য ধর এবং ভালোবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যকে সহ্য কর। যে শান্তি আমাদের একসঙ্গে যুক্ত করেছে সেই শান্তির মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দেওয়া একতা রক্ষা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা করো।”

খ্রীষ্টধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক মূল্যবোধ যা পালনের মধ্য দিয়ে আমরা শান্তিপূর্ণ ও একতাবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলি।





বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ : বাংলাদেশের মালিকানাধীন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির (Geostationary) যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এর মধ্য দিয়ে ৫৭ তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এটি ১১ই মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ছিল ফ্যালকন ৯ ব্লক-৫ রকেটের প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ।

এটি ফ্রান্সের থেলিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক নকশা ও তৈরি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কে-ইউ এবং সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করছে এবং এর আয়ু ১৫ বছর। এর নির্মাণ ব্যয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেট বন্ধিত অঞ্চল যেমন- পার্বত্য ও হাওড় এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা, টেলিমেডিসিন ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে এর উপর নির্ভর করছে। ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকছে। বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়লে এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগ চালু রাখা সম্ভব। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ মহাকাশে উৎক্ষেপণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন, সেই স্বপ্ন মহীরুহে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকশার উপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু-১, বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোত্রামও সেখানে রয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ  
অষ্টম শ্রেণি  
শিক্ষক সহায়িকা  
হিন্দু ধর্ম শিক্ষা



দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করো

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জীবসেবা পরম ধর্ম

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার

১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য